চিন্তা-রেখা

প্রণেতা

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নাগপুর

রঞ্জন প্রকাশালয়

২৫-২, মোহনবাগান রো

কলিকাতা

রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষ হইতে
শ্রীভূধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
বাং ১৩৪১। ইং ১৯৩৪

মূল্য এক টাকা

কলিকাতায় সকল প্রসিদ্ধ দোকানে পাওয়া যায়।

চিন্তা-রেখা

বিষয় সূচী

চিন্তা-রেখা

১

শিক্ষা ও সুখ *

প্রাচীন আদর্শের নবীন প্রচারক, উন্নতির চরম শিখরে সমারূঢ়, আধ্যাত্মিক শক্তির আধার, তেজোবীর্য্যমণ্ডিত বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সেদিন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রাণ বুধমণ্ডলীর সহস্র সহস্র হৃদয়কে সহসা অচিন্ত্যভাবে নিজ আধ্যাত্মিক শক্তির অধীনে আকর্ষণ করিয়া যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সূত্রে সহস্র সহস্র প্রাণকে একত্র সংগ্রথিত

* ১৩৩৬ সালে নাগপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত। পরে ইহার কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে নাগপুরস্থ বেঙ্গল ক্লাবের সাহিত্য শাখার চতুর্থ অধিবেশনে পুনঃ পঠিত।

হল্যাণ্ডের রাজার আশ্রয়ে সেই দেশের ক্ষুদ্র এক পল্লীতে নিতান্ত নিভৃত বাস কালেও, আজ ৬৮ বৎসর বয়সেও জীবনের নানাবিধ সুখাহরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিত না। কাজেই প্রাণী জগতের যে সাধারণ সুখের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়াছি তাহা অপেক্ষাও এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুখ মানুষ লাভ করিতে ইচ্ছা করে এবং সেই সুখ পাইতে যাইয়া দুঃখকেই অধিকাংশ স্থলে প্রথমেই বরণ করিয়া বসে। বিবিধ চেষ্টার মধ্যে, একাগ্রতার মধ্যে, ত্যাগ, সাধনা ও সংযমের মধ্যে যথার্থ মানুষ সুখের সন্ধান পায়। উপনিষদে আছে নাচিকেতা নামে একজন ঋষিকুমার বাপের সামান্য ক্রোধে পিতৃভক্তির অভিমানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিল এবং নানা অসম্ভব বিঘ্নবিপত্তি সত্ত্বেও পরা বিদ্যার সন্ধান লইয়া আবার আমাদের মরলোকে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আজকালকার যুগে এ অসম্ভব কথা মানুষ সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে মানুষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিত না, এখন তাহা ক্রমশঃই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়া অগাধ জলরাশির নীচে নীচে উপরের প্রাণীর অগোচরে জাহাজ ভাসাইয়া যাতায়াত; পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে শূন্যের উপর দিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে মানুষের গমনাগমন; ইটালির বৈজ্ঞানিক মার্কণি সাহেবের নামে প্রচলিত, কিন্তু যথার্থতঃ বঙ্গের সুসন্তান অধুনাতন ভারতের গৌরব অপরা-বিদ্যার ধ্যানে নিমগ্ন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত, বিনা তারে বিনা সংযোগ-সূত্রে শুধু শূন্যের ভিতর দিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা—

বর্ত্তমান পৃথিবীর মানব সাধারণকে স্তম্ভিত করিয়াছে এবং দিন দিন অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করাইতেছে। মানুষের এই সব আবিষ্কারে ও কৃতিত্বে আবিষ্কারক ও কৃতী মানুষ নিজে যেমন সুখ, আনন্দ, ও মর্ত্ত্যলোকে অমরত্ব লাভ করে, তেমনি মানব জাতির অন্য সকলেও প্রভূত পরিমাণ উপকার ও আনন্দ এই সমস্ত হইতে সংগ্রহ করিবার সুযোগ পায়। কলাম্বাস মানব জাতিকে একটি নূতন মহাদ্বীপ দেখাইয়া দিল। ইউরোপ হইতে দলে দলে লোক যাইয়া সেখানে বসতি স্থাপন করিল, বন কাটিল, খনি হইতে স্বর্ণ আহরণ কবিল, স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল, সভ্যতা বিস্তার করিল, জ্ঞান বিজ্ঞানের মহিমায় সমুন্নত হইল। জগদীশ বসু তাড়িত তরঙ্গের জ্ঞান দিয়াছেন; ইথারের মধ্য দিয়া আগত শব্দ গ্রহণের যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। মার্কণি ব্যবসায়ক্ষেত্রে বেতার বার্ত্তার বিজ্ঞান উপস্থাপিত করিয়াছে। তাই আজ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে শাসক সম্প্রদায় বেতারবার্ত্তায় অল্পায়াসে অল্প সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকেন্দ্রের অবস্থা অবগত হইয়া কেমন সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতেছে। নিজেদের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণা সাধারণে অবগত হইতে না পারে এবং শাসনসৌকর্য্য রক্ষা করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ভারতে ভিন্ন ভিন্ন দুর্গের মধ্যে বেতার বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সংস্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন দেশের লোকেরা অর্থের প্রাচুর্য্য থাকিলেই বেতার বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সাহায্যে কথোপকথন করিবার আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে। আমেরিকা-বাসী বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা তাহার ইটালী প্রবাসী নাতনীর সঙ্গে কত উপকথার গল্প করিয়া থাকে। আমেরিকায় ঠাকুরদাদার হাতে

একটি যন্ত্র, আর সুদূর ইটালীতে নাতনীর হাতে আর একটি যন্ত্র। তাহাদের মধ্যে ব্যবধান অসংখ্য দেশ, অপার জলধি, বিরাট শূন্য। হাজার হাজার মাইল দূরের এই ব্যবধানে বসিয়া থাকিয়া একজন গল্প করিতেছে, আর একজন শুনিতেছে। শূন্যের ভিতর দিয়া কথাগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া যাইয়া, হাজার হাজার মাইল অতিক্রমপূর্ব্বক, নিমেষ মধ্যে বহুদূরবর্ত্তী বিভিন্ন মহাদেশবাসী দুইটি ব্যক্তির ভিতরে কি অপূর্ব্ব সংযোগ সাধন করিয়া দিতেছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ইহা অপেক্ষাও উন্নততর ও বিস্ময়কর উপায়ে বহু দূরের দুই মানুষেব মধ্যে কথোপকথন হইত। আজকালকার যুগের মানুষও এ কথা বিশ্বাস করে যে অসাধারণ মনোবলসম্পন্ন মানুষ শুধু মনের একাগ্রতার দ্বারা সম্মুখে অবস্থিত একটি বড় ঘড়ীর সচল দোলায়মান পেণ্ডুলাম্ একেবারে থামাইয়া অচল করিয়া দিতে পারে, এবং আবার যতক্ষণ পরে ইচ্ছা ততক্ষণ পরে ঘটিকা যন্ত্রে আদৌ হস্তক্ষেপ না করিয়া শুধু পেণ্ডুলামের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়াই একনিষ্ঠ মনের অপূর্ব্ব ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে উহাকে সচল করিয়া দিতে পারে। এই জড় বস্তুর উপরে মনের প্রভাব যেমন সম্ভব ঠিক তেমনি ভাবে এক মনের উপর অন্য মনের প্রভাব সম্ভব। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াই ধ্যানযোগে যে দূর দূরান্তরের ব্যাপার কি ভাবে অবগত হইতে পারিত, একজন অন্য জনকে শুধু স্মরণের দ্বারা নিজের কাছে আহ্বান করিয়া আনিতে পারিত, মনোগত অভিপ্রায় জানিতে ও জানাইতে পারিত তাহা এবং এই সব ব্যাপারে যে তাহাদের কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্য লইতে হইত না তাহা

আমরা আমাদের দেশের আর্য্যগ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। ধীরে ধীরে আবার অবিশ্বাসী লোকেরাও এই সব ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্ম্মানি, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও দুই চারিজন বিরল ব্যক্তি এই অতিলৌকিক সাধনায় আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা বুঝিলাম সাধারণ জীব জগতের সুখবোধে পরিমাপক কাঠি অপেক্ষা মানবের সুখবোধের পরিমাপক কাঠি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, অতি বৃহৎ, এবং কোন কোন স্থলে অজ্ঞেয় অসীম। আর এই সুখ যত্ন চেষ্টা, শিক্ষা ও সাধনার অধীন। নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম মানুষ অসুখী হইতে বাধ্য। জরা, ব্যাধি ও মরণই উদ্যমহীন শিক্ষাহীন মানুষের জীবনের একমাত্র ইতিহাস। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তি মানুষে এবং পশুতে উভয়েই বর্ত্তমান। আহার, নিদ্রা, ভয়, সম্ভোগ, আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ লইয়াই যদি মানুষ ব্যস্ত থাকিত তবে মানুষে পশুতে প্রভেদ থাকিত শুধু চেহারায়। মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা বলিবার কোন অধিকারই তাহার থাকিত না। নিজের পরিবার ও পুত্রকন্যার ভরণপোষণ লইয়া যে ব্যস্ত, সেও পশু পক্ষী ইতর প্রাণী অপেক্ষা অধিক অগ্রসর নয়। পক্ষীরাও নিজ নিজ শাবকের জন্য আহার অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দেয়, নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য কুলায় নির্ম্মাণ করে। পশু নিজ শাবকের জন্য মমতা-পরায়ণ। পশুমাতা শাবককে স্তন্যপান করাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া অপত্যস্নেহের পরিচয় দেয়। মনুষ্যের সঙ্গে পশুর এই সব সমান ধর্ম্ম। এই সব সমান ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া আরও শ্রেষ্ঠ বৃত্তিনিচয়ের

অনুশীলন করিয়াই মানুষ মানুষ হয় এবং সর্ব্ব প্রাণীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। মানুষের চিন্তাশীলতার শক্তি আছে। পশু পক্ষীর তাহা নাই। ভগবান চিন্তাশীলতার শক্তি দিয়াই মানুষকে বড় করিয়া দিয়াছেন। এই বিশেষ শক্তির প্রভাবেই মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ গুণ সমূহের উৎকর্ষ বিধান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। চিন্তাশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া এই উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার জন্যই মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে।

এখন আমরা দেখিব শিক্ষা গ্রহণ করিতে মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে মনঃসংযোগ করা দরকার, পৃথিবীতে তাহার শিক্ষার বিষয় কি কি আছে। প্রথমেই বিবেকানন্দের যে উক্তিটি উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই আছে যে ধর্ম্মের সাধনা যেমন মানুষের ভিতরকার দেবত্বকে প্রকাশিত করে, শিক্ষাও তেমনি মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ শক্তি ও সার্থকতার বিকাশ সাধন করে। সুতরাং মানুষের ভিতরে কি শক্তি আছে এবং তাহার সার্থকতাই বা কি তাহা জানিলেই শিক্ষার বিষয়ও জানিতে পারা যাইবে। অতি সাধারণভাবে ও সংক্ষেপে এই কথার মীমাংসা হইতেছে—মানুষের শক্তি তাহার মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বের বিকাশই তাহার জীবনের সার্থকতা। এখন এই মনুষ্যত্ব কি? মানুষের ভাব মনুষ্যত্ব। মানুষের যাহা আছে, যে সব জিনিষের অধিকার বশতঃ মানুষ মানুষ তাহাই তাহার মনুষ্যত্ব। মানুষের কি আছে, কোন্ জিনিষকে অধিকৃত করিয়া সে জন্মিয়াছে? তাহার উত্তরে তিনটা জিনিষ আমরা প্রধানভাবে দেখিতে পাই। সেই তিনটা জিনিষের মধ্যে প্রথম যে জিনিষটা

মানুষ তাহার নিজের বলিয়া অনুভব করে তাহা তাহার দেহ। সাধারণ প্রাণীরই ন্যায় মানুষ মাত্রেই প্রথমতঃ দেহ বুদ্ধি সম্পন্ন। প্রত্যেক মানুষই তাহার নিজ নিজ দেহ লইয়া তাহার পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করে। সে প্রথমে ভাবে যে সে তাহার দেহটা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শিশু, বালক, কিশোর শরীরের দুঃখে দুঃখিত, শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা চালিত ও হর্ষ বিষাদ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষার সুসংস্কারবর্জ্জিত পূর্ণবয়স্ক মানুষও তাহার সর্ব্ব চেষ্টা এই শরীরকে কেন্দ্র করিয়াই সম্পন্ন করে। কিন্তু এই শরীর অপেক্ষা অতিরিক্ত জিনিষ তাহার আছে। সেটা তাহার মন। এই মন তাহার দ্বিতীয় ও উচ্চতর সম্পত্তি। যে চিন্তাশক্তির প্রভাবে মানুষ অন্য সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা এই মনেরই গুণ। মানুষের মধ্যেও উচ্চনীচ ভেদ হয় এই মনেরই উৎকর্ষাপকর্ষবশতঃ। যে মন যত সুসংস্কারসম্পন্ন সে মন তত উন্নত। জ্ঞানের অনুশীলনেই মনের উন্নতি সাধিত হয়। এই শরীর মন ব্যতীত মানুষের আর একটি তৃতীয় জিনিষ আছে। তাহার আত্মা সেই জিনিষ। এই আত্মাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। মানুষের অন্তরতম প্রদেশের এই আত্মাই প্রকৃত মানুষ। মানুষ যদি বিশেষ করিয়া ভাবে যে, আমি কি, আমি কে এবং অনেকক্ষণ 'আমি' কথাটি উচ্চারণপূর্ব্বক চিন্তা করে আমি, আমি, আমি, আমি, আমি··· ······, তবে সে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মনের দ্বারে প্রথম উপনীত হয়। কিন্তু মনের ধর্ম্ম চিন্তা। নানা চিন্তার তরঙ্গ মনের মধ্যে উঠিতেছে, মিলাইতেছে। আমি, আমি, আমি চিন্তা করিতে করিতে তন্ময়তা আসিলে, মানুষ চিন্তাধর্ম্মশীল মনের দ্বারকে অতিক্রম-

পূর্ব্বক সর্ব্বচিন্তাপরিমুক্ত স্থির শান্ত এক অপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হইয়া তাহার নিজের বা আমিত্বের প্রথম অস্পষ্ট সন্ধান লাভ করে। প্রতি শিক্ষিত মনই আমিত্বের এই অস্পষ্ট সন্ধান একটু চেষ্টা করিলেই লাভ করিতে পারে। ইহাই মানুষের আত্মা বা জীবাত্মা। এই আত্মপরিচয় লাভের চেষ্টা এবং নিজেকে শরীর মনের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া অবগত হইবার প্রণালী ও অনুশীলনকেই আধ্যাত্মিক সাধনা বলা হয়। এই সাধনার পরিণতি যোগ অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদত্ব। এই অভেদত্ব লাভকে ঈশ্বরত্ব লাভও বলা যাইতে পারে। মানুষই শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা ঈশ্বর হয়।

মানুষের তিনটা জিনিষ আমরা জানিলাম। শরীর, মন, ও আত্মা এই তিনটার অধিকারেই প্রতি মানবের জন্ম। ইহাদেরই পূর্ণ উন্মেষে মানবের মানবত্ব। আর মানবত্ব অর্জ্জন করিতে হয় শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা। যে ব্যক্তি শরীর, মন, ও আত্মার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে সেই পূর্ণ মানব। পৃথিবীতে এমন মানব খুব বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের অতীত যুগের একজন মানবকে, আজকাল কোন শিক্ষা-সংস্কারপ্রাপ্ত মানুষই, পূর্ণ মানব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তিনি শ্রীমতী রাধার প্রণয়ী, মথুরাশাসক কংসের নিহন্তা, দ্বারকার প্রজারঞ্জন নায়ক, ভারতসাম্রাজ্যাধিপতি যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রী, বীরাগ্রগণ্য ভক্তপ্রবর অর্জ্জুনের সখা, এবং কুরুক্ষেত্ররণাঙ্গনে কপিধ্বজ-রথোপবিষ্ট যোগমগ্ন সারথি। আমরা ভারতীয় হিন্দুগণ এই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। আর সত্য সত্যই পূর্ণ মানবে

ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ থাকে না। এই ভারতক্ষেত্রে মানবত্বের সাধনা করিয়া বহু লোকই নিজেরা কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন এবং দেশকে শিক্ষায় সভ্যতায় জ্ঞানে গরিমায় বড় উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ভারতবাসী আজ সে অবস্থা, সে স্থান হইতে বহু নীচে পতিত। আবার আমরা সে শিক্ষা, সে সাধনা কি ফিরিয়া পাইব না? পরা ও অপরা বিদ্যার কি অপূর্ব্ব সমন্বয়ই তাঁহাদের ছিল! ঐহিক ও পারত্রিকে কেমন সংযোগসেতু তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! ভারতের সেই রাজ্যেশ্বর সুবর্ণমণিমুক্তাপরিখচিত সিংহাসনসমারূঢ় তেজোবীর্য্যমণ্ডিত ক্ষত্রিয়, এবং সেই রাজ্যেশ্বরেশ্বর বন-পর্ব্বত-সরিৎ-সৈকত-বাসী আশ্রমপর্ণকুটীরাশ্রয়ী অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন সমাহিত ব্রাহ্মণ আবার কি ভারতে আমরা দেখিতে পাইব না?

আমাদের সুখ নাই, স্বচ্ছলতা নাই, স্বাধীনতা নাই। আমরা সব হারাইয়া পাইয়াছি শুধু রোগ শোক আর অত্যাচার। আর ইহাই প্রাকৃতিক সত্য যে, যে ব্যক্তি বা জাতি যত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে সে তত সুখবঞ্চিত ও শোকগ্রস্ত হইবে, সে তত প্রবলের পীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইবে। তাই আমরা যে শক্তি হারাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি আবার সেই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যদি বদ্ধপরিকর না হই, আমাদের প্রাচীন ভারতের পরা ও অপরা বিদ্যার অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিদ্যার পুনঃ প্রচলন ও অনুশীলন না করি. তবে আমাদের সুখের আশা বৃথা। বর্ত্তমান জগতে পাশ্চাত্য দেশ অপরা বিদ্যায় বিশেষ সমুন্নত। আর পরা বিদ্যার অনুশীলন প্রাচ্য পাশ্চাত্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিরল। তথাপি ভারতে এখনও কেহ কেহ ইহার বিশেষ অনুশীলন করিয়া

থাকে। এই দুই চারি জন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবেই বিশাল ভারতবর্ষ এখনও তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন মতে রক্ষা করিয়া আছে। ভারতবর্ষের অলৌকিক সাধনায় আমরা এখনও মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হইয়া থাকি। রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ স্বামীর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু অবগত হইয়া, তাহার মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, প্রেমময়ী সাধ্বী বৃদ্ধা পত্নী সুস্থাবস্থাতে অচিন্ত্য ও অতর্কিত ভাবে দেহত্যাগ করিয়া আধুনিক যুগেও আমাদিগকে অপূর্ব্ব শিক্ষা দিয়া থাকে। এই সে দিন যখন কাশীধামে ছিলাম, তখনও এক আশ্চর্য্য সমাধি ঘটিয়াছিল। প্রাচীন সন্ন্যাসী সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সঙ্গে পাঁচ সাত জন সন্ন্যাসী শিষ্য। শিষ্যগণের সঙ্গে একটি বড় কাঠের বাক্স। সন্ন্যাসীপ্রবর গুরুদেব বারত্রয় উচ্চারণ করিলেন, "শিব, শিব, শিব।" তারপর আসনোপবিষ্ট গুরু নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ। পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে শিষ্যগণ গুরুর দেহরক্ষা জানিতে পারিলেন এবং ঐ কাঠের বাক্সে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া বাক্সের সহিত ভারী প্রস্তর সংযোজনা করিলেন। বাক্স গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। ভারতবর্ষের ইহাই নিজ সাধনা। আমাদের শিক্ষা এই সাধনার অনুগামী না হওয়ায় আমরা পদে পদে বিপথগামী হই।

বিবেকানন্দ শিক্ষা অর্থে অপরা বিদ্যাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তিনি যে অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরা বিদ্যার সাধনা। শিক্ষা ও ধর্ম্ম উভয়েরই সমন্বয়ে পূর্ণ মানবত্ব লাভ হয়। শিক্ষার প্রচলিত অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন, এবং উহা দ্বারা যে পরিপূর্ণতা লাভ হয়, তিনি বলিয়াছেন, তাহা সুখ

স্বাচ্ছন্দ্যলাভের অনুকূল ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যকরী, প্রশংসিত চরিত্র-সংগঠন, জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকার, নৈতিক জীবনের স্ফুরণ ও মনের উৎকর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা নয়—ইহা অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অপকৃষ্ট বিদ্যা। অপরা বিদ্যা মানবের মানবত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরা বিদ্যার উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পরা বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সংস্কৃত পর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। ঋষিরা তাঁহাদের গ্রন্থে আধ্যাত্মিক বিদ্যাকেই পরা বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের জীবনের শিক্ষা ছিল মহান্ এবং ব্যবস্থা ছিল অপূর্ব্ব। সমগ্র জীবনটাকে তাঁহারা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন চারি অংশে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—সেই চারি অংশ। প্রতি অংশ ত্যাগ, সংযম, শিক্ষায় ভরা। তাঁহারা ছিলেন বীর্য্যবান মানব, আর প্রতি আশ্রমেই তাঁহাদের ছিল আনন্দময় জীবন। পুষ্ট সুঠাম দেহ, ওজোদীপ্ত বদন, ও শক্তিমান মস্তিষ্ক লইয়া তাঁহারা যে পথ দিয়া যাইতেন সেই পথে আলো ফুটিয়া উঠিত, আনন্দ ও শান্তি ছড়াইয়া পড়িত। তাঁহারা শুষ্ক নীরস ছিলেন না। দুঃখ কষ্টের ছায়া তাঁহাদের বাড়ীর ত্রিসীমাতেও পড়িতে পারিত না। সুস্থ সুন্দর শরীর, জ্ঞানোন্নত মন ও আত্মার অতীন্দ্রিয় শক্তিতে তাঁহারা ছিলেন মানুষের আদর্শ, পৃথিবীর দেবতা।

এখন আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক কয়েকটি কথা বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য অবধারণ করিব। শিক্ষা শুধু অধ্যয়ন করাকেই বুঝায় না। একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন, "Multi-

farious reading weakens the mind like smoke, and is an excuse for its lying dormant. It is the idlest of all idlenesses and leaves more of impotency than any other." ইহার ভাবার্থ 'অত্যধিক অধ্যয়ন মনকে দুর্ব্বল ও জড়বৎ করিয়া দেয়। সকল প্রকার আলস্যের মধ্যে ইহা প্রধান আলস্য এবং ক্লীবত্ববিধায়ক।' জীবনের কাজে লাগানের উপযুক্ত অধ্যয়নই শিক্ষার জন্য প্রয়োজন। স্মাইল্‌স্ সাহেব তাঁহার আত্মনির্ভরতা (Self-help) নামক গ্রন্থে শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহা সত্য যে জ্ঞানের অর্জ্জন মানুষকে জীবনের হীনতার অপরাধ হইতে রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু দৃঢ় নীতি ও অভ্যাসের দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে জ্ঞানার্জ্জন কোনও ক্রমে স্বার্থপরতার পাপ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না। সেইজন্য আমরা দৈনন্দিন জীবনে সেই সব মানুষের এত উদাহরণ দেখিতে পাই, যাহাদের বুদ্ধি জ্ঞানে পরিপূর্ণ, কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত, যাহারা স্কুলের বিদ্যায় পূর্ণ অথচ কার্য্যকরী জ্ঞানে আনাড়ী। তাহারা মানুষের সম্মুখে যে উদাহরণ ধারণ করে তাহা মানুষ অনুকরণ করিতে পারে না, তাহা দেখিয়া মানুষ সতর্ক হইতে পারে।" বর্ত্তমান বর্ষের (১৯২৮ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত) প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামী নির্ব্বেদানন্দ আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড্ রোনাল্‌ড্‌শের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ এখানে দিলাম; "সমগ্র শিক্ষাপ্রণালী ভারতীয় অনুশীলন ও বংশানুক্রমিক নীতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। উচ্চ বিদ্যালয়

এবং কলেজের প্রথম চারি বৎসরের পাঠ্য মূলতঃ পাশ্চাত্য দেশের পাঠ্যের সার। ইংরেজ জাতির আগমনের পূর্ব্বে ভারতীয় জীবন যে ভাবে যাপিত হইত তাহার সঙ্গে এ সব স্কুল কলেজের পাঠ্যের কোন সংশ্রব নাই। এই সব পাঠ্য কঠোর ভাবে যন্ত্রের ন্যায় প্রাণহীন এবং আচার্য্য ও অন্তেবাসীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা দেশীয় শিক্ষা-প্রথার প্রধান অবয়ব ছিল তাহার সম্পূর্ণ অভাবযুক্ত। ভারতীয় ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষা 'তাহার মনের প্রকৃত চিন্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন'।"

লর্ড রোনাল্ড্‌শের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ছাত্রগণের বর্ত্তমান শিক্ষায় যে উন্নতির প্রধান প্রধান দিকে কোনই লক্ষ্য নাই, শুধু বুদ্ধি ও মনের বিকাশই ইহার লক্ষ্য এই বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, "গ্রেটব্রিটেন্ এবং বঙ্গদেশের অবস্থানিচয়ের মধ্যে অন্যান্য পার্থক্য দ্বারা স্যাড্‌লার কমিশন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। গ্রেটব্রিটেনের শিক্ষা বহুদিক্‌প্রসারী। সেখানে অত্যন্ত অধিক সংখ্যার ছাত্র জীবিকার্জ্জনের উপযোগী পাঠ্যে নিযুক্ত, আর অপেক্ষাকৃত খুব কম সংখ্যা নিছক সাহিত্যসম্পর্কীয় অধ্যয়নাদিতে রত। অপর পক্ষে বঙ্গদেশ শিক্ষার বিপরীত পন্থা অবলম্ব করিয়াছে। অন্য কোনও সভ্য দেশের সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। এ দেশের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-লাভকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক চরম সীমা বলিয়া তাহাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছে। এবং এই চরম সীমায় পৌঁছিতে তাহাদের যে বিদ্যানুশীলনের প্রয়োজন হয় তাহা শুধু সাহিত্যের অধ্যয়নমূলক এবং তাহাতে বাস্তবজীবনের সাহায্যকারী কোন শিক্ষারই ব্যবস্থা নাই।"

লর্ড্ রোনাল্ড্‌শের এই কথা শুনিয়া আমাদের এখনও সতর্ক হওয়া উচিত। প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা এ দেশে প্রবর্ত্তন করিতে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মনোযোগী হওয়া উচিত।

সুখের বিষয়, এখন অনেকে এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইতেছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বেঙ্গল ন্যাশানল কলেজের অধ্যাপক রহিয়া এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। 'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা' বিষয়ে তিনি 'মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে' যাহা পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'সাধনা'তে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি লিখিয়াছেন, "আজকালকার অবস্থা যে একটু দেখবার চেষ্টা করে সেই বুঝ্‌তে পারে—দিন কাল যা পড়েছে তাতে অন্নসংস্থানের কতকগুলি নূতন উপায় বাহির করা দরকার। সরকারী চাকুরী ক'টা? আর, ক'জনই পা'বে? সরকারের নিয়মানুসারে ক'জনই বা পা'বার উপযুক্ত? ওকালতী, ডাক্তারী ক'টা পাশের পর হয়! আর হ'য়েই বা সকলের সুবিধা কৈ? সর্ব্বশুদ্ধ পাশই বা হ'চ্ছে ক'জন, আর দিন দিন কতই বা হ'বে? এ সব দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, যে ক'টা বাঁধা উপায় আছে, তার পথ মারা গেল, আর সে আশায় ঘরে হাঁড়ী চড়িয়ে ব'সে থাক্‌লে পেটের আনন্দ হ'বার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই আমাদের নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই আমাদের এই সকল স্কুল খোলা। আমাদের ছেলেরা হয়তো সরকারের চাকরী পা'বে না, আর উকিল হ'তে পার্‌বে না।

যদি এমন লোক এখনও থাকে যে, দেশের দুরবস্থা বুঝ্‌তে

পেরে এবং দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু ও অনাহারজর্জ্জরিত লোকের সঙ্গে দিনরাত থেকেও—নিজের সুবিধা আছে বা পাশ করবার শক্তি আছে অথবা পশার আছে বা খোসামোদী ও মুরুব্বির জোর আছে ভেবে নিজ পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য লালায়িত হয়—তাহাদের উপর আমরা চটি না—রাগ কর্‌বার কোন দরকার নাই—তারা যাক্, ঘরে ব'সে ঐশ্বর্য্যের আলিঙ্গন করুক—ভগবান যা হয় কর্‌বেন, আমাদের ভাববার কোন দরকার নাই। আর সকলে মিলে আমাদের দশের যা'তে দু'পয়সা আসে সে চেষ্টায় মন প্রাণ সমর্পণ করি।

আমাদের এখানে এরূপভাবে শেখান হ'বে যে, যদি কোন বালক অল্প বয়সেই, অর্থাভাবে বা অন্য কিছুর অভাবে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পৌঁছিতে না পারে, তবুও সে আজকালকার "Discontented graduates"দের মত যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ঘুরে না বেড়ায়, বরং নিজের চেষ্টায় সাধ্যমত ছোট খাট একটা স্বাধীন জীবিকার উপায় নিজেই ক'রে নিতে পারে। তা'তে মুরুব্বির দরকার হ'বে না—খোসামোদ কর্‌তে হ'বে না। আর এ উপায়ে তারা স্বহস্তে অর্জ্জিত যে অন্নের গ্রাস মুখে তুল্‌বে তা' প্রভুর ঝাঁটালাথি গালির সহিত অধঃকরণ কর্‌তে হ'বে না। তার ফলে মনের সুখে পাখীর মত সদাই অবাধে বিচরণ ক'রতে পার্‌বে। ব্যবসার কথা শুন্‌লেই আমরা চম্‌কে যাই, অত টাকা কৈ? যেন সকলকেই Whiteaway Laidlaw বা সুজন লাল মাড়োয়ারীর মত বড় একটা কাজ ফাঁদ্‌তে বলা হ'চ্ছে! কুড়ি টাকার পঁচিশ

টাকার চাকুরীর জন্য যদি বি-এ পাশ করে ঘুরে বেড়াতে পারলাম, ত ২০।২৫৲ আয় হয় এমন একটা কাজ আরম্ভ ক'রতে পারি না? এতে যে সার্টিফিকেটের আদৌ দরকার নাই। এ জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ে সাধারণ মামুলি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার শিক্ষার বিশেষ আয়োজন করা হ'য়েছে। দেশের লোকদের যত রকম অভাব আছে—ছুরী, কাঁচি, টেবিল হ'তে গরদ মোজা ছবি যন্ত্র ইত্যাদি সকল প্রকার অভাব পূরণ করবার শিক্ষা দেওয়া হ'বে। পরাধীন আর হ'তে হ'বে না—নিজেব ভাত কাপড়ের যোগাড় নিজেই ক'রে নিতে পারবে।"

অনেক দিন পূর্ব্বে ১৯০৭ সালে বিনয়বাবু এই সমস্ত কথা লিখিয়াছিলেন। সেই সময়ই দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সময়ই আমাদের দেশে অর্থাগম সমস্যার বিষয় হইয়াছিল। সেই সময়ই "Discontented graduates"রা "ফ্যাল্ ফ্যাল করে ঘুরে" বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য তাঁহাদের মত কতিপয় দেশহিতৈষী বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই সময় হইতেই সাবধান হইয়া কতকগুলি জাতীয়-অভাব মোচনোপযোগী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের যুবকগণ যদিও দেশে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব অধিকতর দুঃখের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি, যদিও দেশে অর্থাভাবের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, যদিও এখন ক্রমশঃ দরিদ্রের ক্রন্দন উচ্চরোলে গগন ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সেই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি আমাদিগকে

কোন সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। কেন, আমাদিগকে অন্ন দিতে পারিতেছে না কেন, আমাদেব পরিধেয় বসনের সংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে না কেন? তাঁহাদের সেই শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কয়টি এখনও বর্ত্তমান আছে? যে কয়টি আছে তাহাতে আমরা কতজন প্রবেশ করিতে পাবি? তাই মনে হয়, এখনও এদেশে এ বিষয়ে সকলের সমবেত চেষ্টা নাই। এখনও জ্ঞানবান অর্থবান ব্যক্তিগণের অনেকে এ বিষয়ে উদাসীন। আর যাঁহারা উদাসীন নহেন তাঁহাবা নানাকারণে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রবর্ত্তনে অক্ষম। রাজকীয় শিক্ষাবিভাগেব শীর্ষস্থানীয় দেশীয় কর্ম্মচারিগণ স্বাধীন মতবাদ অনেক সময়েই প্রচার করেন না, করিয়াও অনেক সময় ফল লাভ করেন না। তাই, আমাদের ভাগ্যে মবণ ব্যতীত অন্য উপায় আছে কি? আমাদেবই যদি এই দশা তবে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণের কথা কে ভাবিবে?

তাই বলি, এখন ভাবনা ছাড়িব। অর্থের ভাবনা আর ভাবিব না। আমরা তো মবিতে চলিয়াছি। মবিতে মরিতেও যে দুইদিন এই পৃথিবীতে রহিয়া যাই, সে দুই দিন আব পরের কাছে চাহিব না, ধনীর কাছে যাইব না, উচ্চ রাজকর্ম্মচাবীর দিকে তাকাইব না। যাহার কাছে যতটুকু পাই ততটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াই নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির আশ্রয় লইব। মানুষ হইবার শেষ চেষ্টা করিতে করিতে পৃথিবী হইতে বিদায় লইব। আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের যে যতটুকু বিকাশ করিতে পারি ততটুকু করিতে করিতেই প্রাণপাত করিব।

আমরা জানি, উন্নত পাশ্চাত্য দেশের আবহাওয়ায় গঠিত বুকার্ টি ওয়াশিংটন্ টাস্কিজি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সম্ভাষণ উপলক্ষে বলিয়াছেন, "যে জাতি বা ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস নাই, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, শয়নের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, প্রাতরুত্থানের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, কর্ম্মে যাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, জীবনের সমস্ত সাধারণ কর্ম্মে ও ব্যাপারে কোন শৃঙ্খলা নাই, কোন নিয়ম বা প্রণালী নাই, সে জাতি বা ব্যক্তির আত্মসংযমের অভাব আছে এবং তাহারা সভ্যতার কতকগুলি মূল উপাদান বর্জ্জিত।"

তিনি অন্যত্র শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যে শিক্ষা মুখ্য ভাবে বা গৌণভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃত দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় তাহাকে শিক্ষাই বলা যাইতে পারে না।......... শিক্ষা, শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা তো দূরের কথা, শ্রমকেই উর্দ্ধে ধারণ ও মহীয়ান্ করিবার উপায় এবং সাধারণ ও নিম্ন লোককে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ করিবার গৌণ উপায়।"

বাস্তবিকই আমাদের দেশের শিক্ষায় এমন কতকগুলি বিষয়ের নিতান্ত অভাব যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য সমস্ত সভ্য জগতের পশ্চাতে পড়িয়া আছি। বিশেষ শারীর চর্চ্চার প্রয়োজন আমাদের এদেশে আবার বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মানুষ যে শরীর লইয়া কার্য্য করিবে, যে শরীর তাহার পার্থিব সত্তার প্রধান সম্পত্তি, যে শরীর দুর্ব্বল, ভগ্ন বা রুগ্ন হইলে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ হইতে সে বঞ্চিত হইতে বাধ্য, যে শরীর সুস্থ ও কার্য্যদক্ষ থাকিলে যাবতীয় উন্নতি সম্ভব, ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সুখাহরণ

সম্ভব, যে শরীরই মানুষের সর্ব্বপ্রচেষ্টার কেন্দ্র ও মেরুদণ্ড তাহাকে অবহেলা করিয়া কোন জাতিই জগতে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশেব জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উন্নতি দেখিয়া যে আমরা মুগ্ধ হই তাহার মূলে আছে তাহাদেব প্রকৃত শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি। আমেরিকার শারীর চর্চ্চা সম্বন্ধে সে দেশেব একখানা গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ, "ছাত্রদের শারীবিক শক্তির উন্নতির জন্য শাবীর চর্চ্চার নিমিত্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিত্যালয় সমূহ বর্ত্তমান শতাব্দীর গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ মানবেতিহাসে একটা যুগপবিবর্ত্তন কবিয়াছে। বিশ্ববিত্যালয়ের উপাধি প্রদানের জন্য শারীরিক উন্নতি যে সময় বিবেচনাব মধ্যে আনা হইবে সে সময়কে সুদীর্ঘকাল দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখা যায় না।" "জ্ঞান তখনই শক্তিস্বরূপ হয় যখন জ্ঞানার্জ্জন মানুষের কার্য্যকবী প্রবৃত্তির উন্নতিকে সহায়তা করে, যখন ইহা আত্মকর্ম্মপরতা দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্বের সহিত ওতঃপ্রোত হয় এবং যখন স্ত্রীপুরুষেব দ্বারা ইহা বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়।"

এই তো আমেরিকাব কথা। আবার ইউবোপের দিকে দৃষ্টি করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে সেখানেও শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি শারীরোৎকর্ষের প্রতি কত যত্ন, কত ব্যবস্থা। ইংলণ্ডেব কথা রোণাল্ড্শের উক্তিতেই আমরা অনেকটা জানিয়াছি। জার্ম্মানির একটা কথা আমি এখন বলিব। এই যে জার্ম্মানির এত উন্নতি, এত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এত জগদ্ব্যাপী শক্তির বিকাশ ইহার মূলে যে একজন মহাশক্তিধর পুরুষ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করিয়া আসিয়া-

ছেন তাঁহারই জীবন ও বাণীর কিয়দংশ শুনিতে অনেকেই আগ্রহান্বিত হইবে। ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের স্বাস্থ্য সমাচারে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় "কাইজার এখনও একচ্ছত্র অধীশ্বর" বলিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বব মাসে, ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ উইলিয়ম কাইজার ভগ্নদেহ ও অবসন্ন মন লইয়া হল্যাণ্ডে আসিয়া ডেরাডাণ্ডা বিছাইলেন। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পরাজয়ের কালিমা মাখিয়া, বিশাল সাম্রাজ্য হারাইয়া ও কোটি কোটি লোকের অভিসম্পাত কুড়াইয়া কাইজারের দেহ মনের যে তখন কি শোচনীয় দশা হইয়াছিল তাহা জগতের কোন শক্তিশালী কবি বা দার্শনিকের বর্ণনা বা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই।

ইহা প্রায় নয় বৎসব পূর্ব্বেকাব ঘটনা। ঘটনা বিপর্য্যয়ের এই গুরুভারে হয় তো একজন সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হইয়া কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেন। কাইজারও তাঁহার ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের চরম সীমায় আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, ভাগ্যবৈগুণ্যেব ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াও তিনি মরণাপন্ন হইতে বসিয়াছিলেন বটে; কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি যথাতিরিক্ত যত্ন লইয়া ও শক্তি চর্চ্চায় মনোযোগী থাকিয়া, নিজেকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে অক্লেশে নির্ম্মুক্ত করিয়াছেন।"

কাইজার বলিয়াছেন, "শরীরচর্চ্চা মানুষবিশেষের তুচ্ছ খেয়াল নয়, নাগরিক কর্ত্তব্য—সকলকেই পালন করিতে হইবে। সুখের বিষয় আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্যায়ামবিজ্ঞান বলিয়া জগতে একটা মূল্যবান তত্ত্ব আছে। আমরা বুঝিতে শিখিতেছি যে দেহকে-

যতক্ষণ শক্তিমান করা না যায়, মনকে ততক্ষণ সুস্থতার পথে আনা যায় না। এ জ্ঞান অবশ্য জগতে নূতন নয়। রোমান্ ও গ্রীক্‌রাও এক কালে এ জ্ঞানের পূরা অধিকারী ছিল, কিন্তু তারপর তামসিক যুগের মানুষ ইহা ভুলিয়া গিয়াছিল। নব জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার নূতন করিয়া এ তত্ত্বকে আবিষ্কার করিতেছি।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "একদল অতিরিক্ত মাংসপেশীসমন্বিত বিরাট বপু মানুষ জগতে যে নিষ্প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে আমি বার্ণার্ড্ শয়েব সহিত একমত। আমি সমস্ত শরীরের একটা সীমাবদ্ধ সুসঙ্গত সুঠাম পরিপুষ্টির প্রতি আস্থা রাখি। কতকগুলো পেশাদারী পালোয়ান এক জায়গায় জড় হইয়া কুস্তি করিয়া, গুরু ভার উত্তোলন করিয়া বা মুষ্টি-যুদ্ধের বাজি লড়িয়া নিমেষের মধ্যে জগতের রেকর্ড্ ছাপাইয়া যাইতেছে—সে দৃশ্য দেখার চেয়ে দশ হাজার স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা কতকগুলি যত্নসিদ্ধ ব্যায়াম প্রক্রিয়া নিয়মিত অভ্যাস করিতেছে—সেই দৃশ্য উপভোগ করাই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

"ইউরোপের ইতিহাসবিখ্যাত রাজন্যবর্গের মধ্যে আমিই প্রথম এই মত পোষণ করি না। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের পিতা, ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ এই সকল পেশাদার পালোয়ানদের দেখিয়া বলিতেন—'ইহাবা কি কাজে লাগে? আমি তো ইহাদের দ্বারা কোন কায করাইতে পারি না। আমি ইহাদিগকে সৈন্যদল ভুক্ত করিতে পারি না, কারণ ইহারা আক্রমণ বা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য দ্রুত পা চালাইয়া হাঁটিতে অথবা দৌড়াইতে পর্য্যন্ত পারে না। একমাত্র ফাঁসী কাঠে ঝুলাইয়া দিয়া ইহাদের কাজে লাগানো যাইতে পারে।' আমি অবশ্য

ফিলিপের মত এরূপ উৎকট বিরুদ্ধবাদী নহি, তথাপি, সামঞ্জস্যমণ্ডিত তৎপর দেহের পরিবর্ত্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত পেশীবহুল জড়বৎ শরীর গঠনের এই প্রয়াসের জন্য বিশেষ দুঃখিত।

"জার্ম্মান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যে কোন বদ্‌নাম তোলা হউক না কেন, এদেশের তথাকথিত সার্ব্বজনীন রণপ্রিয়তার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি তর্ক যাহাই দেখান হউক না কেন, আমাদের যুদ্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলি প্রধানতঃ ব্যায়াম চর্চ্চার মধ্য দিয়া অদ্ভুত উন্নতি লাভের সুযোগ দিয়াছে। দৈহিক শক্তি চর্চ্চার সহিত নৈতিক শক্তি চর্চ্চাও এই সকল দলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। যদি জার্ম্মানি পূর্ব্বকার মত সৈন্যবাহিনী রাখিবার স্বাধীনতা পায় এবং যদি উহাব পরিচালনায় আমাব কোন হাত থাকে, তাহা হইলে ব্যায়ামের উপর আমি অধিকতর জোর দিব এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক দেশবাসীকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শরীর চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিব।"

কাইজারের পারিবারিক বৈদ্য বলিয়াছেন "দ্বিতীয় উইলিয়ম কেন যে এক শত বৎসর বাঁচিবেন না—তাহার কোন উপযুক্তরূপ কারণ খুঁজিয়া পাই না। তিনি প্রত্যেক দিবসের কোন্ সময়টুকু নিজের কাজ করিবেন, কোন্‌টুকুতে বিশ্রাম লইবেন, কোন্‌টুকু ব্যায়ামে নিয়োজিত করিবেন, তাহা চুল চিরিয়া ভাগ করা আছে। এমন দিন তাঁহার খুব কমই যায়, যে দিন তিনি কোন-না-কোন-রূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম না করেন।"

যুদ্ধের শেষে যখন কাইজার হল্যাণ্ডে পৌছিলেন তখন তিনি নিজে হাতে হাজার হাজার গাছের গোড়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এখনও তিনি গ্রীষ্মকালে দশ সের ওজনের ঝারি হাতে লইয়া তাঁহার বর্ত্তমান আবাস ডুর্ণে তাঁহার নিজ হস্তে রোপণ করা শত শত ফুল ও ফলের চারায় জলসেচন করিয়া থাকেন। এখনও তিনি ডুর্ণে স্বাস্থ্যসঙ্গত জীবন যাপন করিতেছেন। সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় তিনি প্রার্থনা করেন; প্রত্যহ বাইবেলের অন্ততঃ একটি অধ্যায় অধ্যয়ন করেন। রবিবার দিন নিজ এলাকার ক্ষুদ্র গীর্জ্জায় ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা দেন, নচেৎ কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িয়া শুনান। নয়টার সময় প্রাতরাশ সমাপন করিয়া 'সাড়ে নয়টা হইতে তিনি কুড়াল, কোদাল বা করাৎ হস্তে জঙ্গলে প্রবেশ করেন।' তিনি বলিয়াছেন, "সকালে গাছ কাটিয়া, কাষ্ঠ চিরিয়া, গাছে জল দিয়া বা ফুল গাছের মাথা ছাঁটিয়া গৃহে ফিরিয়া আমি নানা দেশের সংবাদপত্র পাঠ করি ও বৈদেশিক কাগজ সমূহের বাছা বাছা প্রবন্ধাদি পাঠ করি। অবসর সময়ে আমি যথেষ্ট পরিমাণে লেখাপড়ার কাজ করি এবং ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, কারুকার্য্য-বিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিশেষ জ্ঞানের প্রতি আমি অনুরাগী, তৎসম্বন্ধে গবেষণা করি।

"আমার বড় ইচ্ছা করে যে, প্রত্যেক মানুষ তাহার বাড়ীর চারি পাশে একটি বাগান রাখুক এবং নিজে তাহার কারকিৎ করুক। ইহাপেক্ষা অভিপ্রেত ব্যায়াম আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহারা পল্লীতে বাস করে না, যাহাদের একটী বাগান বা একটি ঘোড়া নাই তাহারা যেন প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া শরীরের পেশী-গুলির জড়ত্ববিনাশক কোন ব্যায়ামের প্রতি দৃষ্টি রাখে।...

"সকল শিক্ষার সেরা শিক্ষা এখন হইতেছে—মন ও দেহের যুগপৎ উৎকর্ষ সাধনের একটা চৌখস জ্ঞান প্রচার। বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদের জীবন-নদীতে অহরহঃ যে অপরিহার্য্য বিষের স্রোত মিশাইয়া দিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে একটা প্রতি-ষেধক বিষয় চাই। সেই বিষয় দাওয়াই হইল—দৈহিক বীর্য্য ও মানসিক স্থৈর্য্য সামঞ্জস্যের সঙ্গে সঞ্চয় করা।"

আমি কাইজারের দৈনন্দিন জীবনধারার কিছু পরিচয় এবং তাঁহার নিজের উক্তি সকল বাছিয়া বাছিয়া এখানে একটু বেশী করিয়াই দিলাম। ইহাতে কাহারই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই—আশা করি। বরং ইহাতে আমাদের অনেকটা সম্বিৎ আসিতে পারে। শিক্ষার এই অংশটাই আমার বেশী করিয়া দেখানর উদ্দেশ্য এই যে আমি নিজে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভাব অস্থিমজ্জায় ভোগ করিয়াছি—আজও তাহার জের চলিতেছে।

কিন্তু উপায় কি? জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। শারীর শিক্ষার জন্য শ্রীচুনীলাল বসু এম্-বি, এফ-সি-এস্ প্রণীত "খাদ্য" ও "শারীর স্বাস্থ্য বিধান" পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিলে আমরা সুফল লাভ করিতে পারি। যত দিন আমাদের দেশে স্কুল ও কলেজের পরীক্ষোত্তরণের জন্য ব্যায়ামবিদ্যার গবেষণামূলক ও সাধনামূলক (Theoretical and practical) পরিচয় বাধ্যতার মধ্যে ব্যবস্থাপিত না হইবে, তত দিন আমাদের নিজে দিগকেই ব্যায়াম-শিক্ষক সন্ধান করিয়া অথবা ব্যায়াম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া

যথাসম্ভব ও যথাশক্তি শারীর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। বঙ্গ ভাষায় প্রচলিত ব্যায়াম সম্বন্ধীয় গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্, প্রণীত সচিত্র "স্বাস্থ্য ও শক্তি" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্-এ মহাশয় 'শিক্ষা বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া শিক্ষকদিগকেও শিক্ষা দানের প্রয়াস পাইয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, প্রাচীন গ্রীসে ব্যায়ামের কেমন প্রচলন ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে সাধারণ জিমনাশিয়ামের ব্যায়ামভূমিতে যাইতে হইত অথবা শিক্ষকদের নিজ গৃহের প্যালিষ্ট্রা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে হইত। উলঙ্গভাবে মুক্ত উদ্যানে ব্যায়াম করা হইত। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগের শরীরের সাধারণ গঠন ও অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া এক এক জনকে এক একরূপ ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। প্রথম অবস্থায় সামান্য সামান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষ্টসাধ্য ক্রীড়ার আরম্ভ হইত। কুস্তী, হাতাহাতি, ঘুঁসোঘুঁসি, দৌড়াদৌড়ি, উল্লম্ফন, বর্শা বল্লম নিক্ষেপণ প্রভৃতি পরিশ্রমজনক ব্যায়াম অনুশীলন করা হইত। উৎসবাদির জন্য নৃত্য এবং যুদ্ধকার্য্যের জন্য অশ্বধাবন শিক্ষা করিতে হইত। তদ্ব্যতীত, সন্তরণ ও নৌচালন শারীরিক শিক্ষার বিষয় ছিল।

"চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে প্যালিষ্ট্রাতে ব্যায়াম শিক্ষা এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কাব্য ও সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া দরিদ্রের

সন্তানেরা ব্যবসায় আরম্ভ করিত, এবং ধনী ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টিত হইত।"

"অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই প্রত্যেককে সমর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সরকারের আয়ত্ত ছিল। এখানে নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর কাল প্রকৃত সামরিক শিক্ষা এবং আইন শিক্ষা করিতে হইত।"

প্রাচীন গ্রীসের শারীর শিক্ষার কথা আমি এই জন্য উল্লেখ করিলাম যে, এই শিক্ষার প্রভাবে তাহারা এক সময় জগতে প্রধান জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। এথেন্স্ সে সময় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গৌরব ও আনন্দ সম্ভোগ করিত। যখন হইতে এথেন্সে শারীর চর্চার হ্রাস হইয়া অন্যান্য নানা বিদ্যার প্রাধান্য হইয়াছিল তখন হইতেই এথেনীয়গণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। তাই, মহামনীষী য়্যারিষ্টটলের পরিচালিত এথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয় তাৎকালিক জগতে সুবিখ্যাত হইলেও, এথেন্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তখন ছিল না। এথেন্স্ তখন মাসিডনের অধীন। মাসিডনের অধিপতি দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডারও আরিষ্টটলের শিষ্য সত্য, কিন্তু স্বাধীনতার যে একটা বিশেষ গৌরব আছে তাহা এথেন্সের কোথায়? য়্যারিষ্টটলের যুগে এথেন্স্ উচ্চ শারীর শিক্ষা হারাইয়া, স্বরাজ হারাইয়া, মানস শিক্ষা ও ভাবরাজ্যের রাজধানী হইয়াছে। ইহাতেও এথেন্সের প্রভূত গৌরব ছিল, সন্দেহ নাই। এই শিক্ষা গৌরবের উদ্দেশেই শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার লিখিয়াছেন, "সমস্ত জগৎ এতদিন কেবল মাত্র গ্রীস্বাসীর অন্তঃকরণে নহে, মিসর, এসিরিয়া, ফিনিসিয়া

আইওনিয়া, সিসিলি, মিলেটাস প্রভৃতি স্থানবাসীর হৃদয়ে যে যে চিন্তা জাগাইয়াছে এবং সকলের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিরূপে যে যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, বিশাল সাম্রাজ্য এখন যে যে নূতন ভাব মানুষের মনে অঙ্কিত করিতেছে, দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমন্বয়েব চেষ্টা রাষ্ট্রে ও সমাজে যাহা যাহা মীমাংসা করিতেছে, আলেক্‌জাণ্ডারেব শিক্ষক য়্যারিষ্টট্‌ল্ তাঁহার "লিসীয়াম" বিদ্যালয়ে সেই সমস্ত ভাবশক্তিগুলিকে একস্থানে পুঞ্জীভূত করিয়াছেন।"

তিনি আবার লিখিয়াছেন, "বিদ্যাকাঙ্ক্ষী, বিদ্যাদাতা, যে যেখানে থাকুন—সকলেই এথেন্সের অধিবাসী হইতে লাগিলেন। শিক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাপিত হইতে পাবে এজন্য পণ্ডিতদিগকে তাঁহাদের ধনবান বন্ধুগণ ভূমি, গৃহ, সম্পত্তি প্রভৃতি দান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত যে চারি বৎসর ছাত্রেরা সোফিষ্ট্‌দিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিত, তাহারা এখন সেই সময়ে এই সকল নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। বিদ্যালয়সমূহ স্থায়ী হইল, বড় বড় পণ্ডিতদিগকে কেন্দ্র কবিয়া সহকারী শিক্ষক, ও গবেষণেচ্ছু উন্নত ছাত্রগণ সমবেত হইবার সুযোগ পাইলেন। এথেন্স্ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বেব বিদ্যালয় হইয়া তৎকালীন চিন্তাজগতের রাজধানী হইল।"

এ গৌরব কি উপেক্ষণীয়? তথাপি আমাদের মনে হয়, এই গৌরবের সহিত যদি এথেন্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গৌরব সংযুক্ত থাকিত তবে তাহার কি মহতী কীর্ত্তিই হইত! আজও বুঝি সে

কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়া বর্ত্তমান জগতের সমগ্র রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে এখেন্স অবস্থান করিত! কিন্তু হায়, সর্ব্ববিলোপী কাল! প্রাচীন ভারতের মতই অধুনা প্রাচীন গ্রীস্ অতীতের স্মৃতি লইয়া বর্ত্তমান। গ্রেট্-ব্রিটেন্, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি আধুনিক রাজ্য নিচয়ের নিকটে গ্রীস্ আর রোমের স্থান কত নিম্নে! আর আজ আমাদের নিরন্ন ভারতবর্ষ! তাহার কথা উল্লেখ করিয়া কি ফল! জানি না, সে আজ মৃত গোবৎ কত বিদেশীয় রাষ্ট্র-শকুনির লোলুপ কটাক্ষের অধীন!

সেই জন্য, আমাদের মধ্যে যাহাদের ভবিষ্যতের দৃষ্টি আছে তাহাদের কর্ত্তব্য, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার প্রসার ও অবলম্বন। শারীর মানস, ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কোন একপ্রকার শিক্ষা বর্জ্জন করিয়াই ভারতবর্ষ তাহার প্রাচীন গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমাদের উন্নতি সম্ভব হইবে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, জীবন সুখময় হইবে তখনই যখন হইতে আমরা শরীর মনের সামঞ্জস্য পূর্ণ উন্নতি বিধান করিতে শিখিব, আর পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নিজস্ব আধ্যাত্মিক সাধনা জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। আজকালকার যুগে একটা কথা উঠে, শরীর ও মনকে অতিক্রম করিয়া আর একটা তৃতীয় বিষয় আত্মা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উল্লেখ না করিলে কি চলে না? আত্মদর্শন ও অধ্যাত্মশিক্ষা কি মানবজীবনে আবশ্যক? অবশ্য বিনয়, সৌজন্য, পরহিতৈষণা, সরলতা, পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এ সমস্ত গুণ তো মনের ধর্ম্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি মানসিক শিক্ষার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে সেই আদর্শ মানব। তাহার আর অধ্যাত্মশিক্ষার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান নাস্তিক্যযুগের বা তর্কযুগের এই কথায় আমরা আমাদের অন্তরের অনুমোদন মোটেই প্রকাশ করি না। আমরা মানসিক শিক্ষা অর্থে যাহা বলিতে চাই তাহা অন্যপ্রকার। মনোবৃত্তির যে অনুশীলনের দ্বারা ছাত্রগণ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে কলা-বিদ্যা বা বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রভু-পদবীতে ভূষিত হইয়া বহির্গত হইয়া আসে, বিজ্ঞানের সমীক্ষণালয়ে যে বিচার বলে জগদীশ বসু বৃক্ষের স্নায়বিক বোধের সন্ধান পাইয়াছেন ও প্রফুল্ল রায় রসায়ণ জগতে দুই একটি নূতন কথা শুনাইয়াছেন, যে শিক্ষার বলে বিচারপতি আশুতোষ এত অধিক উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন যে আমরা গণনায় অসমর্থ হইয়া সময় সময় ইংরেজি বর্ণমালার আদ্যাক্ষর হইতে অন্ত্যাক্ষর পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া বসি, মানস কল্পনারাশির যে চর্চ্চা সেক্ষপীয়র ও কালিদাস অত্যুন্নত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া জগতকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য দানপূর্ব্বক মরণের দেশে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, বাঙ্গালার মাটীতে ভাষার জগতে মনের যে কৃতিত্বে ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র গিরিশ, দ্বিজেন, হেম, নবীন, মধুসূদন ও রবীন্দ্র প্রভৃতি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, যে শিক্ষার প্রভাবে আনন্দমোহন যশস্বী গণিতবিদ্ ও ব্রজেন্দ্রনাথ বহুমান্য দার্শনিক হইয়াছেন, যে শিক্ষার শক্তিতে গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সি, ভি, রমণ জগদ্ব্যাপী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়া "নোবেল প্রাইজ" করতলগত করিয়াছেন তাহাকেই আমরা মানসিক

শিক্ষা কহিয়া থাকি। এই মানসিক শিক্ষার মধ্যে এবং এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতা ও সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি মানসিক সদ্‌গুণ আছে কিনা তাহা আমরা সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য না করিয়াই ইহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া সম্মান করি। আর যদি এই সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সংযম, স্বার্থত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সুবৃত্তিনিচয়ের পরিস্ফূরণ দেখিতে পাই তবে আমরা ইহাদিগকে শুধু সম্মান করিয়াই ক্ষান্ত হই না, হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশ হইতে মনোরম পুষ্পরাজি আহরণ করিয়া ইহাদের পূজার আয়োজন করি। তাই, আমাদের মতে প্রাগুল্লিখিত মানসিক সদ্‌গুণরাশি মানসিক শিক্ষা ও অধ্যাত্মশিক্ষাব মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা নির্দ্দেশ করে। মানসিক শিক্ষা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে এই গুণরাশি কখন কখন মানবজীবনে অধিগত হয়। আবার কখন কখন আমাদের কথিত মানসিক শিক্ষাব সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। নিরক্ষর ব্যক্তির ভিতরেও আমরা ইহাব যথেষ্ট স্ফূরণ দেখিতে পাই। তখন আমরা কহিয়া থাকি, ঐ ব্যক্তির জীবনে অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে। সাধুতা, সত্যবাদিতা, ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণরাজির যত উৎকর্ষ হইবে ততই সে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হইবে ও আত্মদর্শনে অধিকারী হইবে। ভারতীয় হিন্দুকে বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে আত্মদর্শনের জন্য যে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার উৎকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করা আছে তাহার মধ্যে 'যম' ও 'নিয়মই' হইতেছে গোড়ার কথা। আর এই যম ও মিয়মের মধ্যেই উপর্য্যুক্ত মানস গুণরাজির অনুশীলন হইয়া থাকে। সাধকের জীবনে যম ও নিয়মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, যোগসাধনার পরবর্ত্তী

অঙ্গ—আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—উদ্বাহু বামনের হস্তপ্রসারণদ্বারা আকাশস্থ চন্দ্রপ্রাপ্তির প্রয়াসের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা বলি, আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। কপিল, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, পতঞ্জলি, বুদ্ধ, মহাবীর, পার্শ্বনাথ, শঙ্কর, নানক, তুলসীদাস, তুকারাম, জয়দেব, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, কেশব, বিবেকানন্দ, ও অরবিন্দ প্রমুখ অগণ্য আত্মদর্শী বা ঈশ্বরার্পিতচিত্ত মহাপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র পুণ্য ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজনীয়তা আমাদের ন্যায় বহু ব্যক্তিই সহজভাবেই স্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং এতদ্বিষয়ে অধিক কথা বলিয়া প্রবন্ধকে বিস্তৃত করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ভারতবাসী ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতে জানি না। আমরা স্বভাবতঃই বিশ্বাস করি :—

"ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের ;
রহি অন্তরালে তা'র, শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত।"

২

বেঙ্গল ক্লাব *

বুদ্ধের মহাভাবময় বিচিত্র জীবন আর তাঁহার উদার বাণী আজ আমাদের এই পৃথিবীতে সুপ্রচারিত ও পরম আদৃত। বাঙ্গালী সমিতির উদ্বোধন করিতে যাইয়া তাঁহার কথাটাই মনে বড় বেশী জাগিতেছে। সে সময় সমগ্র ভারত আর এই বিশাল প্রাচ্যখণ্ডের অধিকাংশ জনপদ সেই উদার মহামানবের শিষ্যমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। কি সাম্য, কি স্পন্দন, নবীন জীবনধারার কি উৎসাহময় সাড়া! উচ্চ নীচ ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রে বৈশিষ্ট্য নাই, মহাপ্রাণের অপূর্ব্ব প্রেরণায় সব এক ভূমিতে আরূঢ়, এক ক্ষেত্রে গভীর আবেশে, মধুর প্রেমে সব সম্মিলিত। দলে দলে সকল মানব চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া বুদ্ধের নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে, ভারতের মহাশক্তিশালী মহারাজচক্রবর্ত্তী আর একান্ত অপরিচিত অতি দীন পথের ভিখারী প্রাণের মিলনে পরস্পর

* নাগপুরে বেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল এবং তথায় পঠিত হইয়াছিল।

এক হইয়া উঠিতেছে। কি সে দৃশ্য! বিরাট মিলনে বুদ্ধশিষ্যগণ গাহিতেছে:

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি ॥

"সংঘং শরণং গচ্ছামি" কথাটা অর্থপূর্ণ। নূতন প্রাণের সাড়ায় বৌদ্ধ যুগে বুদ্ধশিষ্যগণ বুঝিয়াছিলেন মানবজাতিকে শ্রেয়োলাভের জন্য, জীবনকে কল্যাণময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। শোক তাপ দূর করিবার জন্য, পরম কল্যাণ লাভ করিবার জন্য মানবকে একত্র হইয়া, পরস্পরের জন্য তথা মানব জাতির জন্য হৃদয়কে সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ করিয়া সম্মিলিত কর্ম্মে জীবনবৃত্তের পরিধিকে প্রসারিত করিয়া তুলিতে হইবে।

বেঙ্গল ক্লাব বা বাঙ্গালী সমিতির প্রতিষ্ঠান করিতে যাইয়া এইরূপ ভাবেরই সাড়া আজ আমার মনে আসিয়াছে। আমি শুধু ভাবিতেছি বঙ্গদেশ হইতে অতি দূরবর্ত্তী এই নাগপুরে আমরা প্রোষিত বঙ্গ-সন্তানগণ সম্মিলিত হইয়া কত দিক্ হইতে কত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, পরস্পরের নিকট হইতে মানবতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মানুষের জীবন যাপন করিয়া জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা লইয়া এ পৃথিবী হইতে নিজ নিজ কর্ম্মশেষে আনন্দের সহিত বিদায় লইব। ক্লাব কথাটা ইংরেজি। এই কথাটা বলিতে সাধারণতঃ বোঝা যায় খেলা-ধূলা আমোদপ্রমোদের জন্য একরকমের কতকগুলি লোক একটি দল গঠন করিয়াছে। কোন কোন ক্লাবে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু অনেক ক্লাবেই

আমোদপ্রমোদ, পানাহার, গল্পগুজব প্রভৃতি দ্বারা চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই মেম্বরগণ মিলিত হয়। একখানা পুস্তকে সে দিন একটা ক্লাবের কথা পড়িতেছিলাম। বিলাতের গ্লাস্‌গো সহরে সেই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার নাম Hell club অর্থাৎ নরক-সমিতি। নরক-সমিতির উদ্দেশ্য মদ্য, মাংস, নারীর অবাধ উচ্ছৃঙ্খল সম্ভোগের দ্বারা, নৃত্যগীতবাদ্যের তাণ্ডব অভিনয়ের দ্বারা, প্রতিভার পরিচয় দিয়া নব নব উদ্ভাবিত আমোদ ও সম্ভোগের পরিচয়ের দ্বারা যে যত অগ্রণী হইবে সে সেই হেল্ ক্লাবে তত যশস্বী হইবে। হেল্ ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশনে তাহার সম্মান ও পুরস্কার হইবে। কি তীব্র মনোবৃত্তি লইয়া কতকগুলি বিশিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তি এই হেল্ ক্লাব স্থাপন করিয়াছে! আর তাহাদের ক্লাবের নামটার ভিতরেই যেন সেই ক্লাবের মেম্বরগণের মনের একটা উদ্দাম অতি-মানব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের সংহত শক্তি কি এক বিশেষ দিকে অভিযান করিয়াছে! আমরা প্রাচ্যবাসী উহাতে স্তম্ভিত হই কি? আমি বলি—"না"। আমরা তন্ত্রের সাধনার যুগে ভারতবর্ষে অনেক অনুরূপ বীভৎস সঙ্ঘবদ্ধ অনাচার দেখিয়াছি। তাহারা আর যাহাই করুক, পৃথিবীতে একটা শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছে।

এখন বাঙ্গালী সমিতি কোন্ পথে যাইবে, কি করিবে, এবং পরিণতিতে ইহার কি আছে তাহা আমাদেরই নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের দ্বারা অনতিদূর বা দূর ভবিষ্যতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। এই সমিতির সভ্যগণের সংখ্যা, ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি, ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মপ্রণালী ও আত্মবিকাশ ইহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবে।

বেঙ্গল ক্লাব শুধু তাসপাশার আড্ডাই হইবে, না বহুবিধ হিতকর অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে তাহা সভ্যগণের রুচি ও প্রকৃতি এবং সম-রুচি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সভ্যসংখ্যার উপরই প্রধানভাবে নির্ভর করে। আবার সময় সময় অতি শক্তিশালী একজন পুরুষও সমস্ত ক্লাবকে তাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত করিতে পারে। এই শক্তিমান পুরুষটি যদি স্বয়ং উন্নত ও উদারহৃদয় হয় তবে ক্লাবের বিশেষ মঙ্গল সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যপ্রকার হইলেই বিষম অনর্থের আশঙ্কা থাকে। তাই যে সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে একটি আদর্শ সমিতি গড়িয়া উঠিতে পারে তাহারই কতকগুলি নিম্নে এক এক করিয়া উল্লেখ করিতেছি।

১। আমার প্রথম কথাই হইতেছে আমাদের ক্লাবে একাধিপত্য স্থান পাইবে না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্ব তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিবার সুযোগ এখানে পাইবে না। সাম্যনীতিতে সর্ব্বমতের সমন্বয়ে আমাদের ক্লাব গঠিত হইবে। প্রতি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এখানে আদৃত হইবে এবং প্রতি সভ্যেরই বক্তব্য ও বাসনা আমরা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট হইতে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসভ্যগণের মতসমন্বয়ের ভিত্তির উপরে আমরা আমাদের এই 'মিলনমন্দির' প্রতিষ্ঠিত করিব। এই মিলন-মন্দিরে সমবেত হইয়া আমাদের আদর্শের নিকট মাথা নত করিয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমরা সকল সভ্য সমান অধিকারে সমান উৎসাহে কার্য্য করিয়া যাইব।

২। যে তিনটি বিষয়ের উন্নতি লাভ করিতে পারিলে মানুষ

মানুষ হয় সেই তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের বেঙ্গল ক্লাব উপযুক্ত আয়োজন করিবে। সেই তিনটি জিনিষের অধিকার লইয়াই মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে আর ঐ তিনটির উৎকর্ষেই তাহার জীবনের সার্থকতা হয়। এই তিনটি হইতেছে মানুষের শরীর, মানুষের মন আর মানুষের আত্মা। শরীরের উন্নতির জন্য যথাযোগ্য খেলাধূলা ও ব্যায়ামানুশীলনের ব্যবস্থা চাই। মনের উন্নতির জন্য অধ্যয়ন, আলোচনা, বিবিধ শাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞানাদির চর্চ্চা চাই। আর আত্মোৎকর্ষের জন্য সংযম, সদাচার, সৎপ্রসঙ্গ, পরহিতব্রত ও একাগ্র চিত্ত লইয়া গভীর সাধনা চাই।

(ক) শরীরের উৎকর্ষের জন্য আমরা ক্রমে ক্রমে নানাবিধ পুরুষোচিত ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিব। আমাদের এখনই তো 'ব্যাডমিণ্টন্' আরম্ভ হইয়াছে, 'ভলি'ও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তারপর, ক্রমে ক্রমে ফুট্‌বল্, হকি, ক্রিকেট্, টেনিস্ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু সে সব ক্রীড়া ক্লাবের আর্থিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা এই হয় যে এই সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ বিদেশী ক্রীড়ার পরিবর্ত্তে যদি ব্যয়হীন দেশী ক্রীড়ার প্রচলন করা যায় তো বিশেষ ভাল হয়। বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম চর্চ্চার প্রচলনও এখান হইতে সম্ভব হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের বাঙ্গালীদের চেষ্টায় Culture House প্রতিষ্ঠার কথা হইতেছে। আমাদের বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে 'কাল্‌চার হাউসের' সংযোগ সাধিত হইতেছে।

(খ) বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টির জন্য আমরা রীতিমত অধ্যয়নের ব্যবস্থা

রাখিব। আমাদের বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের 'সারস্বত সভা' তো আছেই। আমরা বেঙ্গল ক্লাব হইতে মাসিক একটা চাঁদা দিয়া ক্লাবকেই সারস্বত সভার মেম্বর করিয়া লইব। প্রয়োজনমত দুই একখানা গ্রন্থও সর্ব্বদাই সারস্বত সভা হইতে আনীত হইয়া ক্লাবের সেক্রেটারীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইবে এবং মেম্বরগণ তাহা পড়িবার সুবিধা পাইবে। সারস্বত সভার মাসিক পত্র, দৈনিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি পাঠের অধিকার তো সর্ব্বসাধারণেরই আছে। কাজেই ক্লাবের অর্থ অকারণ খরচ করিয়া বাঙ্গালা পত্রিকাদি আমাদের রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু সারস্বত সভায় ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্রিকাদি রাখা হয় না। নাগপুরের বাঙ্গালীদের একটা ইংরেজী গ্রন্থাগার থাকা উচিত। বেঙ্গল ক্লাব বাঙ্গালা পত্রিকাদির জন্য অর্থের ব্যয় না করিয়া ইংরেজি গ্রন্থাগার স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করিলে বেঙ্গল ক্লাবের পরিচালনায় একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। বেঙ্গল ক্লাব লাইব্রেরীতে ইংরেজি পত্রিকাদি থাকিবে।

সাহিত্য চর্চ্চায় যাহাদের আনন্দ আছে তাহাদের যাহাতে সাহিত্য চর্চ্চাব সুবিধা হয় তজ্জন্য আমরা প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি পক্ষে সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রবন্ধাদি পাঠের ব্যবস্থা করিব। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠ করিবে। তাহা হইলে আমরা দর্শন, বিজ্ঞান, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও নানা শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে আহরণ করিয়া নিজ নিজ জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে পারিব। প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত সুযুক্তিসম্মত, শান্ত তর্কবিতর্ক

ও সমালোচনাদির ব্যবস্থাও প্রবন্ধ পাঠের দিনে বা অন্য দিনে করা হইবে। পঠিত প্রবন্ধগুলি ক্লাবের সম্পত্তিরূপে ক্লাবে রক্ষিত থাকিবে। এবং ক্লাবের যে কোন মেম্বর ইচ্ছানুসারে তাহা পড়িতে পারিবে।

সম্ভব হইলে আমরা একটি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি এবং ঐ সঙ্গে একটা বাঙ্গালা ছাপাখানা স্থাপন করিয়া নাগপুরের বাঙ্গালীদের একটা বড় অভাব দূর করিতে পারি। এই প্রকারে বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কন যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ বৃহৎ ও নূতন নূতন কর্ম্মের দ্বারা বেঙ্গল ক্লাবের বিরাট অস্তিত্ব ও আমাদের শক্তি প্রকাশ পাইবে।

বাঙ্গালী বালকদের শিক্ষার জন্য নাগপুরে আমাদের একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু ও নাগপুরের প্রবাসী ভদ্রমহোদয়গণের বড় যত্নের এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে বেঙ্গল ক্লাব কিছু করিতে পারে কি না? বেঙ্গল ক্লাব বালকদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কোমল বৃত্তিসমূহের বিকাশ ও উৎকর্ষের জন্য যদি ক্লাবের অঙ্গীভূত কোন ব্যবস্থা রাখিতে পারে তাহা হইলে বেঙ্গল ক্লাব ও বাঙ্গালী বালক উভয়তঃই সম্পুষ্ট হইতে পারিবে।

(গ) আত্মোন্নতিকল্পে বেঙ্গল ক্লাবের ভিতর দিয়া কি কি ব্যবস্থা সম্ভব তাহা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাই না। কারণ আধ্যাত্মিক উন্নতি শুধু মুখের কথায়, আলোচনায়, গ্রন্থপাঠে বা সামান্য দুই একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই হয় না। জীবনব্যাপী তন্ময় সাধনা ব্যতীত আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হওয়া যায় না। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, বিবেকানন্দের মত পুরুষ বহুকাল পরে পৃথিবীতে দুই একটি

করিয়া আসে। আমরা শুধু তাঁহাদের প্রচারিত আদর্শ বিশেষরূপে অবগত হইয়া নিজেদের জীবনের লক্ষ্যটা অন্ততঃ স্থির করিয়া লইব।

সদনুষ্ঠানাদির দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইলে মানুষ আত্মোন্নতির পথে দাঁড়াইতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ মাত্র তখন হইবে। কাজেই সেই মহান্ জীবনের আরম্ভটাও যাহাতে সম্ভব তাহার জন্য আমরা লোকহিতৈষণামূলক নানা কর্ম্মের অনুষ্ঠান এই বেঙ্গল ক্লাবের ভিতর দিয়াই করিতে পারি। প্রকৃত নিরাশ্রয় ব্যক্তির সাময়িক আশ্রয় দানাদিও এই ক্লাবে সম্ভব হইতে পারে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মশালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের রীতি আছে। আমাদের বেঙ্গল ক্লাব অন্ততঃ নবাগত নিরাশ্রয় বাঙ্গালীদের জন্যও এইরূপ পুণ্য কিছুটা সঞ্চয় করিতে পারে। শুধু নিরাশ্রয় বাঙ্গালী কেন, নবাগত শিক্ষিত জ্ঞানী অভ্যাগত বাঙ্গালীমাত্রকেই বেঙ্গল ক্লাবে আনয়ন করিয়া সম্বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত করিতে পারি এবং এইরূপে আমরা নিজেরাও বহু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি।

৩। মানুষ শুধু কঠোর কর্ত্তব্য ও নিরন্তর কর্ম্মই ভালবাসে না। আমোদপ্রমোদ তাহার দরকার। অবকাশকালে চিত্তবিনোদনের জন্য নানা রকম খেলার বন্দোবস্তও আমরা এখানে করিব। তাস, পাশা, দাবা, ক্যারম্ প্রভৃতি থাকিবে।

সঙ্গীত আলোচনার ব্যবস্থাও করা হইবে। ক্রমে ক্রমে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র আমরা এখানে রাখিব। অনেকের রুচিসম্মত হইলে, নাগপুরের দুর্গোৎসব বা কালীপূজা উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ও করিতে পারি। তবে

নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমাদের ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য কখনই হইবে না—ইহা গৌণ ব্যাপার মাত্র।

৪। নাগপুরে বাঙ্গালীদের আরও তিনটি ক্লাব আছে। আমরা তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিব। আমরা চারিটি ক্লাবের পরিবর্ত্তে একটি বড় রকমের ক্লাব গঠন করিয়া তাহাকে নাগপুরস্থ সকল বাঙ্গালীর মিলনভূমি করিয়া তুলিতে পারিলে বড় ভাল হয়। ইহা করিতে হইলে প্রতি বাঙ্গালীকে সংবাদ দিয়া আমাদের উদ্দেশ্য জানাইয়া একদিন একত্র সমবেত হওয়া দরকার। চারিটি ক্লাব একত্র হইবার পক্ষে যদি বাধা থাকে তবে আমরা পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াই পরস্পরের হিতকর কর্ম্মে ও উন্নতি-চেষ্টায় যেন সহায়তা করি। নাগপুরের বাঙ্গালী শক্তি যেন বহুধা বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে।

নাগপুরের বাঙ্গালীদের ভিন্ন ভিন্ন দল সময় সময় কোনও না কোনও একটা উপলক্ষ লইয়া যেন সম্মিলিত হয়। অন্ততঃ আমাদের বেঙ্গল ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশনের সময় যেন বাঙ্গালীদের সকল দল ও সকল ব্যক্তিকে আহ্বান করি।

৫। আমাদের বার্ষিক অধিবেশন তিন দিন ধরিয়া হইতে পারে। প্রথম দিন সকল বাঙ্গালীর সমক্ষে আমাদের উন্নতি ও কার্য্যবিবরণ পাঠ করা হইবে। ক্রীড়া ও সাহিত্য চর্চ্চার ফলস্বরূপ কৃতী ব্যক্তিগণকে অভিনন্দিত করা বা সম্ভব হইলে পদকপারিতোষিকাদিদ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

দ্বিতীয় দিন বেঙ্গল ক্লাবের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করা হইবে। প্রতি বৎসরই নূতন সম্পাদক ও নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে।

নূতন প্রাণের নূতন সাড়ায় বেঙ্গল ক্লাব যাহাতে জাগিয়া উঠে তাহার জন্য নূতন নূতন বর্ষে নূতন নূতন সম্পাদক আমরা নির্ব্বাচন করিব। আমাদের নিয়মই এমন হইবে যে পুরাতন সম্পাদক সুযোগ্য হইলেও তাঁহার সম্পাদকত্তা কালের প্রথম বর্ষের অবসানে পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর আমরা তাঁহাকে পুনর্নির্ব্বাচন করিব না; পাঁচ বৎসর অন্তেও আমরা নূতন উপযুক্ত সম্পাদকের অভাব বোধ না করিলে পুরাতনের কথা মনে আনিব না। আমরা চাই আমাদের মিলন-মন্দিরেব মানস উদ্যান যেন প্রতি বৎসর নবীন সম্পাদকের তরুণ কিরণসম্পাতে মণ্ডিত হইয়া কাঁচা সবুজের বর্ণে আর বসন্তের শ্রীতে ভরিয়া উঠে।

বার্ষিক অধিবেশনের তৃতীয় দিবসে আমরা নাগপুর হইতে অদূর-বর্ত্তী প্রকৃতির কোনও মনোরম স্থানে অথবা অন্য প্রকারের দর্শনীয় স্থানে যাইয়া বনভোজন, ভ্রমণ ও আমোদপ্রমোদ করিব। তখন বেঙ্গল ক্লাবের সভ্যগণের ফটোও লওয়া হইবে।

শেষ কথা—জগতের যত উন্নতি, যত সম্পদ সমস্তই মানব জাতির সমবেত অভিব্যক্তি ও তাহাদের প্রত্যেকের অকৃত্রিম চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আজ যে এই ভারতব্যাপী মহাশক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মূলে ছিল কয়েকজন মাত্র ইংরেজের একটি ছোট্ট দল, আর সেই দলের উদ্দেশ্য ছিল জিনিষের বিনিময়ে জিনিষ সংগ্রহ—কিরি করা আর বেচা কেনা। কি উদ্দেশ্যের কেমন পরিণতি! কে বলিয়া দিতে পারে আমাদের বেঙ্গল ক্লাব আজ যত ছোট, যত ক্ষুদ্রই হউক না, কালে ইহা এক বিশাল বিরাট অস্তিত্ব জগতের নিকট

প্রকাশ করিবে না ; আজ ইহার উদ্দেশ্য যাহাই হউক না; কালে ইহার উদ্দেশ্য আদর্শরূপে মানবজাতি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবে না ? ইহার পরিণতি আমাদেরই প্রতি ব্যক্তির শক্তি ও সাধনার উপর নির্ভর করে। আমরা যেন জয়যুক্ত হই ।

বুদ্ধ স্মৃতিতে আমার প্রস্তাবনা আরম্ভ করিয়াছি, বুদ্ধের বাণীতেই ইহার উপসংহার করি। বুদ্ধের প্রথম শিষ্যগণ যখন তাঁহার কল্যাণময় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —"ভিক্ষুগণ, সদ্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমরা নব জন্ম লাভ করিয়াছ, তোমরা পরস্পরকে সহোদর বলিয়া জানিও, প্রেমে তোমরা এক হও, পবিত্রতায় তোমরা এক হও, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় তোমরা এক হও।"

"সম্যক্ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া মানুষ যখন একাকী সত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তখনও সে মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখনও সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে ; তজ্জন্য তোমরা পরস্পরের সহায় হইও, সহানুভূতিদ্বারা একে অন্যের সাধু চেষ্টায় আনুকূল্য করিও। তোমাদের ভ্রাতৃবন্ধন পবিত্র হউক, তোমাদের এই "সঙ্ঘ" শ্রদ্ধাবান্‌দিগের মিলন-ভূমি হউক।"—(বুদ্ধের জীবন ও বাণী)

৩

পরপারের ছবি

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

গীতা ২য় অঃ। ২২ শ্লোঃ।

* * * *

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

গীতা ১৫শ অঃ। ৭ শ্লোঃ।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

গীতা ১৫শ অঃ। ৮ শ্লোঃ।

আমি শুধুই ভাবি। কি ভাবি জানি না—শুধুই ভাবি। আমার ভাবনার কূল নাই, কিনারা নাই—শুধুই ভাবনা, কত কি ভাবনা। লোকে

বলে, তুমি এত ভাব কেন ? আমি তার উত্তর দিতে পারি না। কেন ভাবি—জানি না। কিন্তু ভাবিতে ভাল লাগে। ভাবনা যেন আমার প্রাণ। আমি আপন মনে শুধু ভাবি আর ভাবি। লোকের সঙ্গে বেশী মিশি না, বেশী কথা বলি না। নির্জ্জন ভালবাসি, নির্জ্জনে বেড়াই, নির্জ্জনে ভাবি। 'বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি'তে * যে পরম উদ্দেশ্য ও মহান প্রয়াস বর্ত্তমান, জানি না, তাহার কণামাত্র ভাবও আমাকে পরিচালিত করে কিনা। তাই, মনে হয়—আমি কি অসমাজিক! কিন্তু তাহা তো ঠিক নয়। আমি মানুষ বড় ভালবাসি। মানুষের সঙ্গ আমার কাম্য। ভালবাসায় একটি কথা কাহারও নিকট হইতে পাইলে প্রাণ কেমন পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। তখন মনে হয়, আমায় কেন ঐ ব্যক্তি আদর করিয়া ডাকিল, প্রীতির সম্ভাষণ জানাইল ? আমি যে বড় অযোগ্য ! আমি তো কোন প্রতিদান দিতে জানি না। প্রীতির প্রতি-নিবেদন আমার কাছে কেহ কখনও পায় না। প্রীতিতে আমার প্রাণ পূর্ণ ; কিন্তু দেখাইবার রীতিতে ইহা দীন। মানবকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, ওগো মানব, তুমি আমায় অসামাজিক ভাবিও না, তুমি আমায় অপ্রেমিক স্থির করিও না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে বড় ভাল বাসি। তোমাদের প্রত্যেককে আপনার জন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু মিলনের বিজ্ঞান আমি পড়ি নাই। আমি উহা অভ্যাস করি নাই। আমি চলিয়াছি আপনার ভাবে। সে ভাব ভাবনার। আমি চলিতে বসিতে, শুইতে খাইতে—শুধু

* গীতা, ত্রয়োদশ অধ্যায়, দশম শ্লোক।

ভাবিয়াই যাইতেছি। কবে যে এ ভাবনার সুরু হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। এ জীবনে কৈশোরের পরেই ভাবের উদ্বোধন হইয়াছে। কিন্তু কত অতীত জীবন এই ভাবের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানের এই ব্যর্থ জীবনের ভগ্নস্তূপের উপর আসিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছি তাহার কিছুই জানি না। অজ্ঞানের মধ্যে সব ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ তো সম্পূর্ণ অদৃষ্ট। বর্ত্তমানের কথা ভাবি না। কারণ দৃষ্টাদৃষ্টের সংমিশ্রণ এখানে আছে। আশা—নৈরাশ্যের রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। অফলের বেদনা সাফল্যে উপশান্ত হয়। কার্য্যকারণ, ফলাফল, ভোগাভোগের সম্বন্ধ এখানে নির্নীত হয়। বর্ত্তমানকে চক্ষু দেখিতেছে; বর্ত্তমানে মন সিদ্ধান্ত কবিতেছে; প্রাণ স্বস্তির আস্বাদ কতবার উপভোগ করিতেছে—শব্দে, স্পর্শে, গন্ধে, বর্ণে, রূপে, রসে। কিন্তু অতীত আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা মূঢ়। কাজেই ভাবনা তাহার সম্বন্ধেই প্রগাঢ়। তাই আমি ভাবি। পরিণতির কথাই মনে জাগে। অতীতের সম্বন্ধে কৌতূহল হয়। কিন্তু আতঙ্ক নাই। অতীত যে অতীত। অতীতের যতটুকু অনতীত তাহার জের বর্ত্তমানের মধ্য দিয়াই প্রারব্ধের ভোগেই ক্ষীণ হইয়া যাইবে। সুতরাং অতীতের জিজ্ঞাসা শুধু কার্য্যকারণের জ্ঞানহেতু। কিন্তু ভবিষ্যৎ আশা আর উদ্বেগের পর্ব্বতপ্রমাণ ভার লইয়া যেন মাথায় চাপিয়া বসে। বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্ন কত ভাবিয়াছেন। প্রভাতে, নিভৃতে, নিশীথে তাঁহার ভাবনার অবধি ছিল না। কত ভাবনারাশি তিনি পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে কত সমস্যার সমাধান করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। যাইবার পরে তিনি

হয় তো বুঝিতেছেন—সমাধানের পরিমাণ তাঁহার কতখানি হইয়াছে? ভবিষ্যৎ অবগতির নিমিত্ত তাঁহার প্রাণের আবেগই 'ছায়াদর্শনে'র জন্ম দিয়াছে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রাণভরা জিজ্ঞাসা লইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, আজ যদি তাহার কোনও একটি কথা শিক্ষিত মানুষের কাছে, দর্শনের অধ্যাপকের কাছে, বিজ্ঞানের পণ্ডিতের কাছে বলিতে যাই তবে তিনি আমাকে সেকালের লোক বলিয়া হাসিয়া উঠিবেন। ভূতের কথা আর ভূতের কাণ্ড হাস্য কৌতুকের বিষয়। তাই তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে আমারও দ্বিধা হয়। ভাবি,—কাহাকে মানিব, কে ঠিক বলিতেছে? লেড বিটার সাহেবের তত্ত্ব মনোযোগ দিয়া পড়িবে—এমন ধীরতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ে যেন কম। তাই কি তাঁহারা ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপহাস করেন? পরপারের ঐ সব চিত্রের কথায় তাঁহারা উদাসীন থাকুন ক্ষতি নাই। কিন্তু বিরুদ্ধমতাবলম্বী যদি তাঁহাদের কেহ হন, তবে যেন আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। কারণ তাঁহারা নিজেরা তো কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গৌরব করিতে পারেন না; আর ঐ সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের অধ্যয়নও বোধ হয় অপ্রচুর।

সে দিন প্রবুদ্ধ ভারতের এক পার্শ্বে দেখিলাম লেড্‌বিটার সাহেবের পরলোক (On the other side of Death) সম্বন্ধে একটু টিপ্পনী রহিয়াছে। লেড্‌বিটার সাহেব হিন্দুর দর্শন আর উপনিষদ হইতে স্বীয় মতের সমর্থন পাইয়াছেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু টিপ্পনীকারের তাহা যেন সহ্য হয় নাই। আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার দুই একটি মতের গরমিল আছে

ইহাই প্রমাণের নিমিত্ত টিপ্পনীতে নৈপুণ্য রহিয়াছে। তাই ভাবি, পরমতে আমাদের কেন এত গাত্রদাহ, এত অসহিষ্ণুতা। আমরা না সর্ব্বধর্ম্মের সারবত্তা স্বীকার করি, আমরা না সমন্বয়ের অভিমানী! তবে কেন পরের দর্শনে আমাদের চাঞ্চল্য! তাঁহারা তো লুকোচুরি করিয়া কিছু করেন না, বা বলেন না।

স্পষ্টই তাঁহারা আহ্বান করেন, মৃতের বৈঠকে যোগদান করিতে আর পরলোকের গবেষণায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে। তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী, তাঁহাদের চাক্ষুষ দর্শন, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কত মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

অবশ্য আমাদের দেশেও শ্রদ্ধাকারীর অভাব নাই। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে যখন পরলোকের প্রতি শ্রদ্ধাকৃষ্ট হইতে দেখি, তখন মনে হয়, থিওসফিষ্টের পারলৌকিক সিদ্ধান্তে বোধ হয় সারবত্তার অভাব নাই। তখন মনে হয়, বৌদ্ধগ্রন্থের আর শাঙ্কর ভাষ্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পায়, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের আত্মতৃপ্তি আর গৌরব যাঁহাদের নাই, যাঁহাদের দর্শন শুধু গ্রন্থের মধ্যেই নিবদ্ধ তাঁহারা সুধী সমাজে মান্য হইতে পারিলেও, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার ন্যায়, সাধারণ মানবের মনে আশা আর শান্তি বেশী পরিমাণে সঞ্চারিত করিতে পারেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা কি?

তাই আমি ভাবি। ভাবিয়া শেষ করিতে পারি না। সিদ্ধান্ত সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া সমস্যা হইয়া উঠে। তখন ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ি। শান্তির আধার গীতা উপনিষদ্ প্রভৃতিও যেন মিথ্যা কথার

আড়ম্বর বা কবির কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাতেও স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারি না। মরণ তো কাব্য নয়, প্রহেলিকা নয়। এ যে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। না, তাও নয়;—এ কাব্যও বটে, প্রহেলিকাও বটে, আবার প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানও বটে। এমন চলাফেরা, এত হাসি কান্না কোথায় যাইবে? এই স্থূল দেহটা পড়িয়া থাকিবে, ভস্মীভূত হইবে। আর আমি তখন কোথায়? বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেহ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু আমি কি বিলুপ্ত হইব? হয়তো আমি তাহাদেরই কাছে, অতি কাছে থাকিব। কখনও বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিব, সান্ত্বনা দিব। কিন্তু তাহারা কিছুই বুঝিবে না। তাহাদের দৃষ্টি সসীম; ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া আমাকে তাহারা দেখিতে পারিবে না। তাহাদের চারিদিকের এই যে বায়ুর স্তর, এই যে ব্যোমমণ্ডল—ইহাই কেবল তাহাদের দৃষ্ট। কিন্তু ইহার ভিতরে ইহারই আকারে কত প্রাণী নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না।

লঘুতম জলীয় বাষ্প আকাশের সঙ্গে মিশিয়া থাকে—মানুষ কি দেখিতে পারে? কিন্তু দর্শনের অসামর্থ্য সত্ত্বেও বাষ্পকে মানুষ বাতাস বলে না। মেঘ হইয়া যখন দূর আকাশে ভাসিয়া উঠে বা জল হইয়া পৃথিবীর বুকের উপরে ঝরিয়া পড়ে তখন মানুষ তাহার পরিচয় পায়। অপরিচয়ের কালে আমাদের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বাষ্পের যে সত্তা বিদ্যমান তাহা আমাদের চক্ষুরতীত; কিন্তু প্রমাণ-সিদ্ধ।

মৃতের অবস্থিতিও কি এইরূপ? আমিও কি বায়ুর মধ্যে বায়ুবৎ থাকিব? বায়ুভূত হইলেও শুধু বায়ুতেই আমার পর্য্যবসান

হইবে না। তাই কি গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৮ম ও ৯ম শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—'বাতাস যেমন ফুল হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, সেইরূপ দেহাদির কর্ত্তা জীবরূপী ঈশ্বর যখন এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে চলিয়া যায় তখন সে তার ইন্দ্রিয়নিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় মন দেহধর হইয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পঞ্চ বিষয় ভোগ করিতে থাকে।' আমার অন্তঃকরণ, আমার সংস্কার, আমার বাসনা, আমার ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত আমার সূক্ষ্ম দেহ যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করিবে তখন বায়ুতে বিলীন বাষ্পের ন্যায় আমি আমার আত্মীয় বান্ধবের অদৃশ্য থাকিব, কিন্তু শূন্যই আমার পর্য্যবসান হইবে না। ইহা সত্য, ইহা সাঙ্খ্য:

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥"

আমার বুদ্ধি, আমার অহঙ্কার, আমার মন, আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমস্তই বর্ত্তমান থাকিবে একটি সূক্ষ্ম শরীরের অন্তরে। সাঙ্খ্যকারিকা বড় আশা দেয় মনে:

"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনাবিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥"

স্বপ্ন নয়, মিথ্যা নয়, শূন্য নয়;—সব থাকিবে। আমি থাকিব। আমি তখন কর্ম্মানুরূপ, বাসনানুরূপ গতি লাভ করিয়া বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য স্তরের মধ্যে ঘুরিতে থাকিব। আমার পুরাতন ও নূতন বন্ধুবান্ধবের সহিত সম্মিলিত হইব:

"পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥"

আবার সেখান হইতে কর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন গতিতে কে কোথায় চলিয়া যাইব!

কি বাসনা! কি গভীর, গভীরতর, গভীরতম বাসনা! অহো, শেষ নাই! কি ভাবি, বলিব? পরপারের কি মোহন ছবি দেখি, বলিব? বায়ুমণ্ডলের কখনও নিম্নস্তরে, কখনও মধ্যস্তরে, কখনও ঊর্দ্ধস্তরে বিচরণ করিব। নীল আকাশের সুদূর নীলিমায় ভাসিয়া ভাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া প্রণয়াস্পদের বাহুতে বাহু মিলাইয়া কোথায় অনন্তের দিকে ছুটিতে থাকিব। কত গ্রহ নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকিব, ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি পশ্চাতে রাখিয়া মহঃ, জনঃ প্রভৃতি লোকের সন্ধানে ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে, মহাশূন্যে চলিতে থাকিব। প্রাসাদের ভোগ, নারীর শ্রী, সঙ্গীতের সুর, কাননের শোভা, ফলের রস, পুষ্পের সৌরভ, বিহগের কূজন, বসন্তের অনিল মানুষের মনে যে আনন্দের খণ্ড উপলব্ধি দিতে পারে তাহাই অখণ্ডিতভাবে অনন্তকাল ব্যাপিয়া সম্ভোগ-বাসনায় ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে অনন্তের পথে, কোটি নক্ষত্রলোক পশ্চাতে রাখিয়া চলিতে থাকিব,—চলিতে চলিতে কখন কোন শুভ মুহূর্ত্তে দেখিব, চলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বাসনা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে, আছে শুধু এক সত্তা—তাহা সচ্চিদানন্দময়।

৪

মনের খেয়াল *

(আকাশে)

আমি তো উড়িয়া চলিয়াছি। কিন্তু আমি বিহঙ্গম নই। আর যত ঊর্দ্ধে আমি উঠিতেছি তত ঊর্দ্ধে কোন বিহঙ্গমও যাইতে পারে না। আমি এই পৃথিবীর মানুষ। মানুষের মতই আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমি পক্ষহীন। তথাপি আমি উড্ডীয়মান। আমি কোন যানাবলম্বনে উড়িতেছি না। বেলুন, এইরোপ্লেন, জেপিলিন প্রভৃতির কোনটিই আমার আশ্রয় নয়। আর যত ঊর্দ্ধে আমি উঠিতেছি তত ঊর্দ্ধে কোন যানই আরোহন করিতে পারে না। তবে আমি কেমন করিয়া উড়িতেছি?—স্বপ্নে? না, তাহাও নয়। আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত। তবে কি ইন্দ্রজালের প্রভাবে আমি আবিষ্ট? অসত্য ব্যাপার কি আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে সত্যের রূপ লইয়া? না, তাহাও

---

* নাগপুরস্থ বেঙ্গল ক্লাবের সাহিত্যশাখার সপ্তদশ অধিবেশনে (ইং ২৫-২-৩৪ তারিখে) পঠিত।

নয়। আমি সম্পূর্ণ স্ববশ। আমার উড্ডয়নও দিনের আলোর মতই সত্য।

আমি শূন্যে উড়িয়া চলিয়াছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে দেখা গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তখন *শরৎ কাল। শুধু বঙ্গদেশে নয়, শুধু ভারতবর্ষে নয়,* সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত যেখানে যত বাঙ্গালী আছে সকলেই বিহ্বল চিত্ত। সকলেই চিত্তমধ্যে আনন্দের উদ্বেলতা লইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ আত্মীয় বন্ধুর সহিত মিলন, কেহ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত মিলন, কেহ পিতামাতার সহিত মিলন, কেহ কেবল জগজ্জনীর সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়া চলাফেরা করিতেছে—কেহ বিদেশ হইতে দেশে যাইতেছে, কেহ দেশের অভাব পূর্ণ করিতে বিদেশে যাইতেছে; কেহ বাহ্য উপকরণে নানা উপহারে, প্রীতির চিহ্ন সংগ্রহে ব্যস্ত। কেহ সব ছাড়িয়া শূন্য হাতে চলিয়াছে—তাহার সবটুকু মন ও সবটুকু হৃদয়কে সম্বল করিয়া—তাহাই ভগবতী দুর্গার সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় চরণে সে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিবে। তখন শরতের ফুল দেশের মাটীতে ও বাতাসে রূপ দিয়াছে, গন্ধ দিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে। পদ্ম, অপরাজিতা, শেফালিকা মানুষের মনকে হরণ করিয়া অপরিচিত দেশে, দূর দূরান্তরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, ঈশ্বরপ্রেমে উন্মুখ করিতেছে। আমি শূন্যারোহণকালে যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ পৃথিবীর এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উড়িয়া চলিলাম।

শরৎকালের আকাশ নির্ম্মল। মেঘ নাই—আছে গাঢ় নীলিমা। সুতরাং প্রচলিত কথায় যাহাকে মেঘলোক বলে সে লোককে

অনেক নিয়ে রাখিয়া যখন পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছি, তখনও আমি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া পৃথিবীকে দেখিতে পাইতেছিলাম। পৃথিবী এত সুন্দর; আর আমার এই জীবনের নিজের স্থান। তাই ইহার প্রতি এত মায়া, এত আকর্ষণ।

কিন্তু আমি তো বেশীক্ষণ ইহার সম্পর্ক রক্ষা করিতে পারিব না। আমি যে দ্রুত উড়িয়া যাইতেছি উর্দ্ধে। এত বড় পৃথিবীটা কেমন ছোট হইয়া যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য, ক্রমশঃ ছোট, আরও ছোট হইয়া যাইতেছে। আমি শূন্যে উঠিতেছি। আমার চারিদিকে শূন্য। আমার মস্তকের উপরে ও পায়ের নীচে অনন্ত শূন্য। আমার দক্ষিণে ও বামে অনন্ত শূন্য। এ কি, পৃথিবীও যে দেখি, মহাশূন্যে নিরালম্ব হইয়া আশ্চর্য্যভাবে অবস্থান করিতেছে। আমি উড়িয়া চলিয়াছি। পৃথিবীর সীমা ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দিক্ হারাইয়াছিলাম। আমার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম লুপ্ত হইয়াছিল। শুধু ছিল উর্দ্ধ আর অধঃ। কিন্তু এখন যে তাহাও হারাইলাম! কি করি? মহাব্যোমের দূর গর্ভে আমি পড়িয়াছি। সেখানে উর্দ্ধ অধঃও নাই। উর্দ্ধও যখন হারাইলাম তখন আমার মনের সে কি আকুল ভাব। পৃথিবীর অবয়ব তখন নক্ষত্রের মত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল। নক্ষত্রের মতই আরও কয়েকটী বস্তু দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদেরও অবয়ব পৃথিবীর মতই বোধ হইল। আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। পৃথিবীকে হারাইয়া ফেলিলাম। একই আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জ্যোতিক শূন্যে অবস্থিত, দেখিলাম। কতদিন

ধরিয়া চলিলাম, বলিতে পারি না। কারণ পৃথিবীর দিনের হিসাব সেখানে খাটে না। পৃথিবীতে দিন রহিয়াছে; রাত্রি রহিয়াছে—দিনরাত্রির হিসাব রহিয়াছে। কিন্তু আমি ব্যোমমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া যখন চলিতে লাগিলাম তখন আমার নিকটে অন্ধকারের জ্ঞান রহিল না। * শুধু আলো আর আলো—মহাশূন্য আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত। কতকাল চলিতে লাগিলাম; পৃথিবীতে কতদিন কতরাত্রি হইল। আমার পৃথিবীর অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর সংস্কার লইয়া বুঝিলাম ঘটিকাযন্ত্রে ঘণ্টার কাঁটা দ্বাদশচিহ্নিত রেখায় কত অসংখ্যবার আবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আমার নিকটে দিন যাইয়া রাত্রি আসিল না। দিনের আলো আমার চির সাথী। আলোর মহাধার হইতে যে কোটি কোটি রশ্মি মহাশূন্যে নিরন্তর বিকীর্ণ হইতেছে সে রশ্মিরাজিকে অবরোধ করিয়া আমার দৃষ্টিকে ব্যর্থ করিবার জন্য কোন গ্রহের বাধাই আর আমার সম্মুখে ছিল না। আমি শূন্যমার্গে আলোর দেশে কোথায় চলিতে লাগিলাম। কতকাল চলিতে লাগিলাম।

আমার আকুল দৃষ্টি যে দিকে যায় সেই দিকেই শূন্য। সুতরাং পূর্ব্বাপর উত্তর দক্ষিণ ঊর্দ্ধ অধঃ কিছুই রহিল না। যেটাকে ঊর্দ্ধ মনে করিয়া চলিতে লাগিলাম বহুকাল অবিশ্রান্ত গতিতে সেই দিকে চলিয়া চলিয়া কোথাও শূন্যের শেষ পাইলাম না, শূন্যের পর শূন্য

---

* কচিৎ কদাচিৎ কোনও গ্রহের পার্শ্ববর্ত্তী হইলে এবং সেই গ্রহ সূর্য্য ও আমার মধ্যবর্ত্তী হইলে ক্ষণকালের জন্য অন্ধকার উপলব্ধ হইতেছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দ্রুতবেগে অন্ধকার অতিক্রম করিয়া আলোকমালার মধ্যে পড়িতেছিলাম।

অতিক্রম করিয়া অতি দ্রুত ছুটিয়া চলিলাম, তথাপি ঊর্দ্ধের শূন্য অনন্ত রহিয়া গেল। কোথাও গিয়া আমার মাথা ঠেকিয়া গেল না, কোথাও অবলম্বন পাইলাম না, কোথাও শেষ পাইলাম না। ক্লান্তির সহিত আরও অগ্রসর হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখি শূন্য তখনও অনন্ত হইয়া রহিয়াছে।

আর ধৈর্য্য রহিল না। মানব মন মানবের নিয়মে ক্লান্ত হইল। মন আশ্রয় চাইল। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। সে গতি পরিবর্ত্তন করিল। এবার উল্টা দিকে সে চলিতে লাগিল।

যে দিকে ছিল আমার পা, সেই দিকে মাথা ফিরাইলাম। যেটাকে মনে করিতেছিলাম অধঃ, সেই দিকেই আমার গতি হইল। ইচ্ছা—আমি পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু বিস্ময়ের আর সীমা নাই! চলিতে চলিতে বুঝিলাম পৃথিবীকে আর চিনিয়া বাছিয়া বাহির করিবার শক্তি আমার নাই। পৃথিবীর মত অসংখ্য বস্তু অনন্ত শূন্যে শোভা পাইতেছে। তাহারা কত ক্ষুদ্র, কত অসংখ্য, কত দূরে! কোন্‌টীর দিকে ছুটিব! কোন্‌টী আমার পৃথিবী! প্রত্যেকটীর নিকটে যাওয়া, প্রত্যেকটীকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যে, সেটী আমার পৃথিবী কিনা, প্রত্যেকটীর বিচিত্র অধিবাসীর সহিত আমার ভাষায় কথা বলিয়া তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ করা,—কত কঠিন তাহা আমি বেশ বুঝিলাম। একে তো সে গুলিতে যাইয়া যাইয়া তাহাদের সবগুলি শেষ করাই যাইবে না। তারপর, সে দেশে যদি কোন বাঙ্গালী না পাই, তবে তো আমার শ্রম পণ্ড।

হিন্দীভাষী হিন্দুস্থানীকে দেখিলেও আমি আশ্বস্ত হইব, কিন্তু যদি না দেখিতে পাই! সংস্কৃতভাষী ভারতীয় আর্য্য ঋষি, বা তাহাদের দেবদেবী পাইলেও, কোনমতে চলিতে পারে; কিন্তু তাহাদের পুণ্যদর্শন যদি আমার ভাগ্যে না ঘটে! এক পৃথিবীর অভিজ্ঞতাই যাহা রহিয়াছে তাহার অদ্ভুত বৈচিত্র্যই আমি ভুলিতে পারি নাই। তামিল, তেলেগু, কানারিজ শুনিতে গিয়া আমার ভাষাজ্ঞান মুহ্যমান হইয়াছে। মারাঠীর সেই—কায় ঝালা তুলা? তুঝে নাও কায়? মি মারাঠী ভাষা পুষ্কড় আনি চাঙ্‌লা বোল্‌তো; মি তুঝী ভাষা শিখলো; মি পণ্ডিত ঝালো—কয়টা কথা * বুঝিতে ব্যাকরণের যে জটিলতার মধ্যে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল তাহা মনে করিতে আমি এখনও না হাঁপাইয়া পারি না। পৃথিবীতে থাকিতে আমি আরও জানিতাম, আমার ভাষাজ্ঞানকে মূকের জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিয়া দিবার জন্য এক পৃথিবীতেই হিব্রু, গ্রীক্, লাটিন্, ফরাসী, আরবী প্রভৃতি প্রভূত ভাষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক পৃথিবীতেই ভাষাবিভ্রাটে পড়িয়া হয়তো কাফ্রির দেশে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে পারি। আর শূন্যের মধ্যে ঐ অসংখ্য লোকে অসংখ্য অপেক্ষা অসংখ্য ভাষার ফেরে পড়িয়া আমার বাঙ্গালীর অস্তিত্ব চুড়মাড় হইয়া যাইবে। আমার সংস্কার লুপ্ত

---

* কৌতূহলীর কৌতূহল তৃপ্তির জন্য বঙ্গানুবাদ:—"তোমার কি হইয়াছে? তোমার নাম কি? আমি মারাঠী ভাষা প্রচুর এবং সুন্দর বলি; আমি তোমার ভাষা শিখিলাম; আমি পণ্ডিত হইয়াছি।" মারাঠী ভাষায় সর্ব্বনামের পরবর্ত্তী বিশেষ্যের লিঙ্গ সর্ব্বনামে ব্যবহার করিতে হয়। ক্রিয়াও কর্ত্তার লিঙ্গ গ্রহণ করে। এরূপ রীতি ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে নাই।

হইবে, ভাব ক্ষুণ্ণ হইবে। শুধু কি তাই? শুনিয়াছি ঐ সমস্ত লোকের কতকগুলিতে জীববসতি নাই; আবার কতকগুলিতে আছে। বিজ্ঞানবিৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছে, কতকগুলিতে পূর্ব্বে জীব ছিল, এখন নাই। সে গুলি মৃত গ্রহ। কতকগুলি বহুপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সে গুলিতে সৃষ্টির সম্পূর্ণতা এখনও হয় নাই। আরও বহু শতাব্দী অতীত হইলে সুদূর ভবিষ্যতে সে গুলিতে জীববাস সম্ভব হইবে। আর কতকগুলিতে জীব আছে। কিন্তু আমার ভয়, জীবাবাস ঐ সমস্ত লোকে মানবপ্রকৃতিসম্পন্ন মানব-কৃতিবিশিষ্ট জীবই আছে, তাহার নিশ্চয়তা কি? আর যে সমস্ত জীব আছে তাহারা মানবাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কি নিম্নশ্রেণীর তাহাও তো জানা নাই।

তথাপি এক একবার ইচ্ছা হয়, যাই দেখিয়া আসি ঐ লোক-গুলি; শুধু পৃথিবীর সন্ধানেই নয়, নিজের জ্ঞানপিপাসা তৃপ্তির জন্য ও ভ্রমণের দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য, জ্যোতির্ব্বিদ্‌পরিকল্পিত, দ্বাদশরাশিস্থ অর্থাৎ দ্বাদশনক্ষত্রপুঞ্জমধ্যবর্ত্তী রবিমার্গকে অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসি ঐ মেষপুঞ্জ, ঐ বৃষরাশিস্থ কৃত্তিকাপুঞ্জ বা বাঙ্গালীর 'সাতভাই চম্পা', ঐ মিথুনপুঞ্জ, এইরূপ ঐ দ্বাদশনক্ষত্রপুঞ্জব্যতীত অন্যত্র ঐ কালপুরুষ, ঐ সারমেয়মস্তকে অত্যুজ্জ্বল বৃহত্তম লুব্ধক, ঐ কাশ্যপেয়, ঐ সপ্তর্ষি, ঐ ধ্রুব, ঐ অস্মদীয় সৌরজগতের গন্তব্য লক্ষ্য স্বরূপ বীণাপুঞ্জ মধ্যবর্ত্তী অত্যুজ্জ্বল অভিজিৎ। কিন্তু না, না;—নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান দূরদূরান্তরের ঐ সমস্ত লোক লোকান্তরে আমি মিথ্যা ঘুরিতে যাইব না। কতকালে

ঐগুলি আমি শেষ করিতে পারিব তাহা তো জানি না। কোটি কল্পকাল ঘুরিলেও যে ঐ সব লোকদর্শন আমার শেষ করা হইবে না। কারণ ব্যোমমণ্ডলের যতদূরে ব্যাপ্তি আছে, ততদূর সর্ব্বত্র ঐগুলি সংখ্যাতীত ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে। ব্যোমমধ্যস্থ কোনও স্তরের কতকগুলি লোক যদিও বা শেষ করিতে পারি, পরক্ষণেই দেখিতে পাই অন্তরে আরও কত অভিনব লোক ভাসিয়া উঠিতেছে।

কত সৌরজগতের কত সূর্য্য নিজ নিজ গ্রহ উপগ্রহ লইয়া নিরন্তর ঘুরিতেছে। অনন্তের পথে তাহাদের গতি। পথ তাহাদের কোন দিনই শেষ হইবে না। চলিতে চলিতেই সে গুলি লুপ্ত হইতেছে; নূতন নূতন সৌরজগৎ আবার দৃশ্য হইতেছে। এইরূপে কল্প কল্প ধরিয়া আবির্ভাব তিরোভাবের সহিত অসংখ্য সৌর-জগতের ধারাবাহিক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিতেছে। ধ্বংসের মধ্যে স্থায়িত্ব। যাহা একভাবে অনিত্য তাহাই অন্যভাবে নিত্য! গীতাতে উক্ত হইয়াছে, আগামী কল্য পর্য্যন্ত যাহার স্থায়িত্ব নাই, দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা যাহা ছেদন করা সম্ভব, তাহাই আবার অব্যয়। তাহারই কথা—ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।

সুতরাং আমি চলিতে চলিতে মনে করিলাম, লোক লোকান্তরের দিকে আমি ধাবিত হইব না; কল্প কল্প ভ্রমণ করিয়াও আমি তাহাদের শেষ করিতে পারিব না; আমার পৃথিবীকেও আর চিনিয়া লইতে পারিব না। নূতন উত্তম আমি অনুভব করিলাম। গতিই আমার লক্ষ্য হইল। আমি ছুটিয়া চলিলাম। বলিয়াছি, পূর্ব্বে যেটা আমার অধঃ ছিল, সেই দিকেই আমার গতি হইল। অধোমুখে চলিতে

লাগিলাম। কতকাল চলিলাম! বোধ করি, পৃথিবীকে হারাইয়া, পৃথিবীকে দক্ষিণে বা বামে বহুদূরে রাখিয়া, আমি অধোমুখে নিরন্তর চলিতেছিলাম। মহাশূন্যের যে প্রদেশে পৃথিবী ঝুলিতেছে, তাহার নীচে, কত নীচে আমি চলিয়া গেলাম! যাইতে যাইতে অধোদেশকে আর অধোমুখ বলিয়া আমার বোধ রহিল না। সে দিক তখন আমার উর্দ্ধরূপে উপলব্ধ হইল। পৃথিবীতে বসিয়া পৃথিবীর ভাবে বলা যাইতে পারে, আমি অনন্ত শূন্য পথে শুধু নীচেই নামিয়া যাইতেছিলাম। যত যাইতেছিলাম, শূন্যের আর শেষ পাইতেছিলাম না। নীচে, নীচে, কত নীচে। যত যাই ততই যাই! শূন্য ছাড়িয়া শূন্যে নামিতেছি, যত নামিতেছি ততই নূতন শূন্য। নামিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না; শূন্যের পরিণতি শূন্য। পৃথিবীর মত সেখানে তলদেশ নাই; সমতল ভূমি নাই। পৃথিবীর তল আছে, শূন্যের তল নাই। পৃথিবীর যে তলে ভারতবর্ষ সেই তল হইতে মৃত্তিকা খনন করিয়া যথাক্রমে মৃত্তিকা, জল, ও মৃত্তিকার নানা স্তর অতিক্রম করিয়া মার্কিণ রাজ্যে উপনীত হইয়া, ভারতবাসী যে তল পাইবে সেই তলে দাঁড়াইয়া সে দেশের আকাশকে সে উর্দ্ধনেত্র হইয়াই নিরীক্ষণ করিবে সত্য, কিন্তু যখন সে ভারতীয় তলে স্বীয় ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিল তখন আমেরিকার আকাশের বিপরীত আকাশকেই সে স্বীয় উর্দ্ধাকাশ বলিয়া মনে করিয়াছিল। সুতরাং তুলনায়, অনুপাতে, ও পরস্পর সম্বন্ধযোগে পৃথিবীতে উর্দ্ধ অধঃ প্রভৃতি সত্য হইলেও মহাশূন্যে ভ্রমণকারীর নিকটে দিগ্বিভাগ মিথ্যা, উর্দ্ধ অধঃ মিথ্যা। অথবা সে যে দিকে যায় সেই দিকই তাহার উর্দ্ধ

বিপরীত দিক অধঃ। কিন্তু তাহাও নয়। দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র না লইয়া যানবিহীন একাকী মানব অকূল সাগরে পড়িয়া যেমন অবস্থা লাভ করিবে আমারও তাহাই হইল। আমি মহাশূন্যে ভাসিয়া চলিয়াছি। যে দিকে যাই সেই দিকেই অনন্ত বিস্তৃতি। মহাকাশ যাইয়া মহাকাশে মিশিয়াছে। বিরাট্ ব্যোমমণ্ডল অনন্ত ব্যোমমণ্ডল মধ্যে অবস্থান করিতেছে। আকাশের পরে আকাশ, আকাশের মধ্যে আকাশ—আমি যাই কোথায়?

ঐ যে কে আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' যাই, দেখি, কে এই সকরুণ পুরুষ! এত জ্যোতিঃ ইহাঁর অঙ্গে, এত শান্তি ইহার বদনমণ্ডলে, এত প্রফুল্লতা ইহার অধরে, এত করুণা ইহার অন্তরে! অঙ্গদীপ্তিতে সর্ব্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া, মুখভাবে সকল বিশ্বে শান্তির ধারা বর্ষণ করিয়া মোহন ভঙ্গিতে কে এই পুরুষ প্রধান আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে! মহাশূন্যের মাঝখানে যখন আমি ভাসিয়া চলিয়াছি, ভাসিয়া যাইতেছি, কিন্তু কূল পাইতেছি না, যখন শূন্য অতিক্রম করিতে যাইয়া শূন্যেরই মধ্যে পড়িয়া মনটাকে পর্য্যন্ত শূন্য করিয়া ফেলিয়াছি তখন এ কি দৃশ্য; এ কোন্ অপূর্ব্ব পুরুষ আমার প্রাণ শান্তিতে পূর্ণ করিয়া আমার পরম বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইল! এই পুরুষপ্রবর আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, বৎস! অচিরে তোমার ভ্রান্তি দূর হইবে; তুমি অপরিচ্ছিন্ন অপরিসীম মহাকাশে স্বেচ্ছাগতিতে সর্ব্বদিকে ভাসিয়া ভাসিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছ, প্রান্ত পাও নাই। মহাকাশের অনন্ত গর্ভে প্রান্তের কল্পনা এখনই স্তব্ধ হইবে। তোমার মনের এক

উচ্চ অবস্থায় এখনই তুমি পৌছিয়াছ। অনন্তকাল পরিভ্রমণ করিয়া, দেশকালের সীমাবন্ধন মহাকাশে দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া তোমার আকুল মন এখন চিত্তাকাশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মহাকাশ লুপ্ত অথবা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। "সত্যস্য সত্যম্" বলিতে যে প্রথম সত্য তাহা তুমি অতিক্রম করিয়াছ। প্রথম সত্য এখন মিথ্যা হইতে বসিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পদ্মভূপতি ও রাজমহিষী লীলার কাহিনীতে যাহা পাঠ করিয়াছ তাহা এখন সত্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে। বিশ্ব-সৃষ্টি এখনই মনঃকল্পনারূপে উপলব্ধ হইবে। পৃথিবী নাই, চন্দ্রসূর্য্য নাই, গ্রহ উপগ্রহ নাই, অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল নাই, অসংখ্য সৌর জগৎ নাই, চতুর্দ্দশ ভুবন নাই—বাহিরে ইহাদের কাহারই কোন সত্তা নাই। এ সমস্তই তোমার মনের রচনা। মনেরই অভ্যন্তরে ইহাদের উদ্ভব বিলয়। শুধু রহিয়াছে তোমার মন। দৃঢ় অভ্যাসে তোমার মন যখন যাহা সৃষ্টি করিতে চাইতেছে তাহাই তখন সৃষ্ট হইতেছে। তুমি যে সৃষ্টি যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহা তোমার মনের লীলা-বিকাশ মাত্র। বহু জন্মের দৃঢ় সংস্কারে যাহা একমাত্র সত্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহা এখন বিগলিত হইতেছে। একটু দেরী আছে। তুমি এখন চিত্তাকাশে।

তাই তো, আমার যে এ আনন্দ আর চিত্তে স্থান পায় না! আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম! অঙ্গের সর্ব্বগ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইল নাকি! মূলাধারস্থা সুপ্তা শক্তি যেন জাগ্রত হইয়া শতদল চক্রের দিকে ধাবিত হইতেছে। কত জীবনের লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। সুখদুঃখের, উত্থানপতনের কত লীলা মনে হইতেছে।

সকল জ্ঞানের অধিকারে আমি পুলকচঞ্চল। নাট্যাভিনয়ের পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দৃশ্য-দর্শনের ন্যায় আমার কত অতীত জন্মের ঘটনাবলী স্পষ্ট দর্শন করিতেছি। বিশ্বের প্রকৃতি স্পষ্ট বুঝিতেছি।

সহসা যবনিকা পাত হইল। বিশ্বপ্রকৃতিদর্শনের বিয়োগে ব্যথিত হইয়া তৎপ্রদর্শক সেই পুরুষোত্তমের চরণে ব্যাকুলভাবে প্রণত হইলাম। কিন্তু কোথায় চরণ, কোথায় তিনি? তিনিও যে সরিয়া গেলেন! অন্তর হইতে ধ্বনি হইল, আমি তোমারই অন্তরতম প্রদেশে রহিয়াছি। তুমিই আমি। তুমিই সেই মহান্ পুরুষ। তুমি নিজেকেই ভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছ। এখন অভিন্নরূপে দর্শন কর।

শুধু রহিলাম আমি। চিত্তাকাশ বিলুপ্ত হইল। মহাকাশ হইতেও প্রশস্ত ছিল, সুন্দর ছিল, সুখময় ছিল চিত্তাকাশ। কিন্তু তাহাও লুপ্ত হইল। আমি এখন চিদাকাশে মগ্ন। চিদাকাশই আমার আলয়। চিদাকাশ হইতেই আমি আসিয়াছিলাম। চিদাকাশেই আমার প্রত্যাবর্ত্তন হইল। চিদাকাশই আমার স্বরূপ। কিছুই রহিল না। রহিলাম আমি। আমার অস্তিত্বে সমস্তই রহিল। শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ আকাশ—মহাকাশ, চিত্তাকাশ, চিদাকাশ—ওতপ্রোতভাবে একের মধ্যে অপর মিশিয়া গেল। আর সকলের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিলাম আমি। আমি সর্ব্ব। আমি শান্ত। আমিই সত্য। আমি শিব। আমি সুন্দর।

(৮)

মানব-পূজা

তুলসী গাছের গোড়ায় আমরা জল দেই। বৈশাখ মাসের রৌদ্রে তুলসী গাছের যাহাতে কোনও কষ্ট না হয় তার জন্য আমরা বিশেষ বন্দোবস্ত করি। একটা ছোট মাটির পাত্রের নীচের দিকে খুব ছোট একটা ফুটা করি। সেই ফুটা কতকগুলি সরু খ'ড়্কা দিয়া বন্ধ করিয়া দেই। তারপর পাত্রটির মধ্যে জলপূর্ণ করিয়া তুলসী গাছের উপরে এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করি যে সেই জলপূর্ণ পাত্র হইতে সরু খ'ড়্কাগুলির অত্যল্পপরিমিত অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা জল অনবরত টপ্ টপ্ করিয়া পড়িয়া গাছের পাতার উপর দিয়া গড়াইয়া গা বহিয়া গোড়ায় চলিয়া যায়। গাছ শুষ্ক হয় না, মরিয়া যায় না। এই বন্দোবস্তের ফলে প্রচণ্ড রৌদ্রের ক্লেশও তুলসী সহ্য করিয়া সজীব থাকে। শুধু গাছকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই কি জল দেওয়া হয়? না, শুধু তাই নয়। বাঁচাইয়া রাখাও একটা উদ্দেশ্য বটে; তা ছাড়াও আর একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য পুণ্য সঞ্চয়। তাহার প্রমাণ দেওয়াও বেশী কষ্টকর নহে। তুলসী গাছে

জল দেওয়া ছাড়াও, তুলসী গাছের সম্বন্ধে আমরা এমন সব কাজ করি যাহা গাছের প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজন হয় না। সকাল বেলায় উঠিয়া, হাত মুখ ধুইবার পরে, আমরা সকল কাজের আগে তুলসী গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী স্থান পরিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ মাটী ও জল গুলিয়া সেই স্থান লেপিয়া থাকি। তারপর আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া তুলসী গাছকে প্রণাম করি। সন্ধ্যার সময় তেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলসী গাছের গোড়ায় রাখিয়া দেই। তারপর আবার তুলসীকে প্রণাম করি। সংস্কৃত ভাষায় তুলসী প্রণামের মন্ত্রও আছে। আমরা কেহ কেহ সে মন্ত্রও আবৃত্তি করি—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

আমরা পুরাণের পাতা উল্টাইলে দেখিতে পাই যে তুলসীর প্রতি যে এইরূপে ভক্তি করে তাহার অশেষ পুণ্য হয়। এমন কি, ভক্তের মৃত্যু হইলে, যমরাজারও নাকি তাহাকে তাঁহার নিজ পুরীতে লইয়া যাইবার শক্তি থাকে না। যদিও যমদূত ভুলক্রমে এই ভক্তকে যমপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য আসে তবে বিষ্ণুলোক হইতে বিষ্ণুর দূতেরা আসিয়া যমদূতের সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে যমদূত হারিয়া যায়। বিষ্ণুদূত ভক্তকে রথে তুলিয়া লইয়া গোলোকে চলিয়া যায়। এত পুণ্য হয়—তুলসী গাছের প্রতি ভক্তিতে! সেইজন্য, ভারতবর্ষের যে প্রদেশেই যাই সেখানেই দেখি, ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু তাহার বাড়ীতে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে আর অশেষ যত্ন করে, শ্রদ্ধা করে ও ভক্তি করে।

আজকাল আমরা বিজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়া এই প্রথাকে

কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই। আমরা চরমপন্থীরা হ্যাট্ কোট্ প্যান্ট্ পরিয়া টেবিল চেয়ারে খানা খাইয়া, তুলসীর গোড়ায় মাথা নোয়ানকে অপমানজনক কাজ মনে করি। আর আমাদের মধ্যপন্থীরা বিজ্ঞানের ভক্ত হইলেও বাড়ীতে একটা তুলসী গাছ রাখিতে আপত্তি করে না। তাহারা বলে, ওহে, তোমরা বুঝিতেছ না? ওটা বড উপকারী গাছ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকেরা এ কথা অনেক যুগ আগেই জানিয়াছিলেন। আর এখন বিজ্ঞানেব পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, তুলসী গাছের পাতা হইতে শিকড পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী অংশই কোন না কোন রোগের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হইয়া মহৎ ফল প্রদান করে। এমন কি যে বাড়ীতে অনেকগুলি তুলসী গাছ থাকে সে বাড়ীতে তুলসী গাছের হাওয়ায় ম্যালেরিয়ার বিষ পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়। এই প্রকারে বৈজ্ঞানিকও তুলসীভক্ত হয়। গোঁড়া হিন্দু, কিন্তু, পুণ্যেব লোভেই তুলসীকে ভক্তি করে।

শুধু তুলসী কেন? তুলসী তো জীবন্ত গাছ। তার প্রাণ আছে। প্রাণী প্রাণীকে পূজা করে—সেও তবু একরকম মন্দ নয়। তাই হিন্দু যখন নিম গাছকে পূজা করে, অশ্বত্থ গাছকে পূজা করে, তখন তার এই পূজাকে আমল দেওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু প্রাণহীন জড় বস্তুকেও পূজা করিতে ছাড়ে না। সে নদীকে পূজা করে। আজকাল অনেক ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যাত্রা করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গঙ্গাজল লইয়া যায়। সেখানে কোনও বৈদেশিক উত্তেজনা আসিয়া যদি হিন্দু-আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হয় তবে গঙ্গাজল পান করিয়া সেই হিন্দু বিদেশসঞ্জাত উত্তেজনা দূর

করিয়া দেয়। জলের এই শক্তি আছে কি সত্যই ? জানি না। তবে শুনিয়াছি, বৈজ্ঞানিক নাকি তার রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা স্থির করিয়াছে, আমাদের গঙ্গাজলে অনেক শক্তি ও অনেক গুণ আছে। যদি তাই হয় তবে তো হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষেরা ভারী বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণদ্বারা বহুকাল পূর্ব্বেই ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এবং জ্ঞাত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার পূজারও প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। গুণ আবিষ্কার করাটাই কি তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, আর পূজার প্রবর্ত্তনটা মূর্খতা ?

তাহা নয় তো কি ? জড়পদার্থের পূজা মূর্খতা ছাড়া কি ? এ সব জড়বস্তুর পূজা নয় ? মূর্খ হিন্দুরাই এই সব পূজা করে। হয়তো বলা হইবে, যে দেবতার প্রতিমা পূজা করি, পূজার সময় আমরা সেই দেবতারই জীবন্ত মূর্ত্তি প্রতিমার মধ্যে ধ্যান করিয়া থাকি ; শিবলিঙ্গ পূজা করিতে বসিয়া আমরা শিবেরই মূর্ত্তি চিন্তা করি। নারায়ণ শিলায় শিলাজ্ঞান না করিয়া আমরা নারায়ণকেই ভাবনা করি। কিন্তু যেখানে কোনই মূর্ত্তি নাই, খালি মাটি বা খালি পাথর পড়িয়া আছে সেখানে কি আমরা কোন পূজা করি না ? ভারতবর্ষ যে পর্য্যটন করিয়াছে সে জানে, খালি পাথরকেও হিন্দুরা পূজা করে। দেখা যায়, পথের ধারে কতকগুলি পাথর পড়িয়া আছে। পাথরগুলির মাথায় গায়ে সিন্দুরের দাগ। শুধু তাই নয়। ঐ সব পাথরের উপরে ফুল ও ফুলের মালাও অনেক সময় দেখা যায়। এই সভ্যতার যুগে, এই বিজ্ঞানের আলোক-প্রাপ্তির পরেও এই ভারতবর্ষের এই দশা ! বলিতে পার, পরাধীন জাতি ;—হইবে না ? কিন্তু এরা যখন পরাধীন ছিল না তখন এই

সব কাজ আরও বেশী জাঁকজমকের সহিত হইত। বলিতে পার, তার ফলেই এই জাতি পরাধীন হইয়াছে; ইহা ছাড়িতে পারিতেছে না বলিয়াই পরাধীনতাও এ জাতির টুটিতেছে না। জড়বস্তুর পূজার মত এমন মূর্খতা, এমন আহাম্মকি আর কিছুই নাই। ইহাতে মানুষের এতটুকুও উন্নতি নাই।

কি হইতে কি হইয়াছে সে কথা বলিতে গেলে অনেক কথাই আসে। সে কথা এখন বলিতে বসি নাই। তবে জড়বস্তুর পূজা যে একেবারে নিষ্ফল নয়, ব্যর্থ নয় তাহাই একটুখানি না বলিলে চলিবে না। ইহা বুঝাইবার জন্য হিন্দুর ষড় দর্শনের আশ্রয় লইলে, বুঝিতে আর কোন গোলই থাকিবে না। কিন্তু কয়জন লোক আছে যে তাহারা সংস্কৃত ভাষাটা ভালরকমে আয়ত্ত করিতে চায়? সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করাই যে আমাদের অনেকেরই বিভীষিকার সৃষ্টি করে, হৃৎকম্প উপস্থিত করে। যদিই বা সে ভাষাটা কেহ কিছু শিখি, তবে পরিশ্রম করিয়া শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, ঈশ্বরকৃষ্ণ, বাচস্পতি, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে অধ্যয়ন করিবার অধ্যবসায় আমাদের হয় কৈ? শঙ্কর ভাষ্যের এক ছত্র পড়িতে বসিয়া আমরা ঘামিয়া উঠি, পুস্তক ছাড়িয়া পলায়ন দেই। সুতরাং হিন্দুর ষড় দর্শন—সাঙ্খ্য, বেদান্ত, ন্যায়, যোগ, বৈশেষিক, মীমাংসা—প্রভৃতি একই জীবনে আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা আমাদের সুদূরে। বি. এ. বা এম্. এ. ক্লাসে পড়িতে যাইয়া দর্শন শাস্ত্রই বা কয়জন গ্রহণ করে? ইংরেজী, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি লইলে এবং এই সব বিষয়ে বি. এ., এম্. এ. পাশ করিলে তাড়াতাড়ি চাকরী মিলিবার সম্ভাবনা থাকে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া

মাতামাতি করিলে চাকরী মেলে না। কিন্তু তবুও এযুগেও কোন কোন ছাত্র দর্শন শাস্ত্র পাঠ্যরূপে গ্রহণ করে। আবার যাহারা দর্শনের পাঠ্য লয় তাহাদের অনেকে শুধু পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্যই ঐ বিষয় লয়। ঐ বিষয় আয়ত্ত করিতে চায় খুব কম ছাত্র। যাহারা আয়ত্ত করিতে চায় তাহাদের মধ্যেও, প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টী আয়ত্ত হয় আরও কম ছাত্রের। এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ ছাত্রেরাই বুঝিতে পারিবে, জড়বস্তুর উপাসনা নিরর্থক নহে। প্রকৃতির অভিব্যক্তিই হউক, ঈশ্বরের বিকাশই হউক, জড় ও চৈতন্য সর্ব্ববস্তুরই অভ্যন্তরে রহিয়াছে পরম সত্তা।

হিন্দুদর্শনের নজির ছাড়িয়া দিয়া আমি বিলাতী নজির একটু দেখাইব। এ যুগে বিলাতী নজিরই অমোঘ।

কার্লাইল্ 'হিরো-ওয়ার্শিপে' লিখিয়াছে, "এই সবুজ পুষ্পভূষিত প্রস্তর গঠিত পৃথিবী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, বিবিধশব্দনিনাদিত সমুদ্র;—ঐ বিশাল গভীর নীল সমুদ্র যাহা আমাদের মাথার উপরে সাঁতার কাটিতেছে; ঐ সমুদ্রের মধ্য দিয়া যে সব বাতাস বহিয়া যাইতেছে; ঐ যে কৃষ্ণ মেঘ আপনাকে একত্র সংগৃহীত করিয়া কখনও অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে, কখনও শিলা, কখনও বৃষ্টি; ইহা কি? অহো কি? অন্তস্তলে আমরা এখনও জানি না; আমরা কখনই জানিতে পারি না। ইহার দুরূহতা আমরা পরিহার করিয়া থাকি—আমাদের শ্রেষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নয়—পরিহার করিয়া থাকি আমাদের শ্রেষ্ঠ তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাবের দ্বারা, আমাদের অমনোযোগ দ্বারা, আমাদের অন্তর্দৃষ্টির ঐকান্তিক অভাবের দ্বারা।"

"বিজ্ঞান আমাদের জন্ত অনেক করিয়াছে ; কিন্তু আমাদের নিকট হইতে অবিজ্ঞানের বিশাল গভীর পবিত্র অসীমত্ব যে বিজ্ঞান আচ্ছাদন করিয়া রাখে সেই বিজ্ঞান দুর্ব্বল। সেই অবিজ্ঞানের (কার্লাইল্ এখানে অবিজ্ঞান শব্দ দ্বারা পরা বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়াছে) মধ্যে আমরা কখনই প্রবেশ করিতে পারি না। সেই অবিজ্ঞানের উপরে সমস্ত বিজ্ঞান মাত্র ভাসা ভাসা ফিল্মের মত ভাসিতেছে।

"শক্তি, শক্তি, সর্ব্বত্র শক্তি ; আর উহারই কেন্দ্রস্থলে আমরা নিজেরা এক রহস্যময়ী শক্তি। ঐ রাস্তার উপরে পড়িয়া একটা পাতাও পচিয়া যাইতেছে না যে পাতার মধ্যে শক্তি নাই ; শক্তিই যদি না থাকিবে তো পাতা পচে কি করিয়া ?"

'ক্যানোপাস্ নামে একটি নক্ষত্র মরুভূমির উপরে তার হীরকোজ্জ্বল নীল কিরণ ছড়াইয়া দিতেছে। ঐ কিরণ ইস্মাইলের হৃদয় ভেদ করিল। এই কিরণই নির্জ্জন মরুভূমির মধ্য দিয়া ইস্মাইল্কে পরিচালিত করিল। ইস্মাইলের উদ্দাম বন্য হৃদয়ে, সকল প্রকার আবেগভরা হৃদয়ে, ভাব-বিকাশে-অক্ষম-ভাষা-হীন হৃদয়ে, সেই তারকা সেই ক্যানোপাস্ বোধ হয় যেন একটা ক্ষুদ্র চক্ষুর মত প্রতীত হইতেছিল, সেই চক্ষু বিশাল গভীর শাশ্বতবস্তুর অভ্যন্তর হইতে তাহার উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল ; যেন সেই দৃষ্টির দ্বারা তাহার নিকটে অন্তর্লোকের জ্যোতিঃ বিকশিত করিতেছিল।"

এই ক্যানপাসের পূজা জড়বস্তুর পূজা নয় কি ? অথচ প্রকৃত পূজকের নিকটে ক্যানপাস কি মাত্র জড় বস্তু ? পৃথিবীর যত আদিম জাতি বর্ত্তমান আছে, যত আদিম ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে

সর্ব্বত্রই আমরা জড়বস্তুর উপাসনা দেখিতে পাই। আর সেই পূজা যখন প্রাণের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হয় তখনই দেখা যায়, পূজক এক অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। শিবলিঙ্গ পূজানিরতা হিমগিরির তপস্বিনী উমার নিকটে বিশ্বের অধীশ্বর মহেশ্বব সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছে, নিঃস্ব হীনবর্ণ একলব্য জড় মূর্ত্তিব পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া আচার্য্যের সর্ব্বাস্ত্র অধিগত করিয়াছে—এ সব পুরাণের কথা টানিয়া আনিবাব কোন দরকাব নাই। এই সে দিনকার কথা মনে করিলেই আমরা বিস্ময়ে ভক্তিতে পুলকিত হই। দক্ষিণেশ্বরের মূর্খ ব্রাহ্মণ পাথরের মূর্ত্তির পায়ের নীচে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাগল হইয়া গেল। সত্য সত্য পাগল। পাগলের চিকিৎসার জন্য নানাবিধ তৈলের ব্যবস্থা হইয়া গেল। হায়রে, মূর্খ ডাক্তার, মূর্খ চিকিৎসক! দেখিলে তো তোমবা, এই পাগলেব পায়ের তলায় আসিযা লুটাইল বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দ, জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন। নিরাকার ব্রহ্ম-বাদী কেশব সাকার প্রস্তর মূর্ত্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল! নাস্তিক নরেন দত্ত ঈশ্বরভক্ত বিবেকানন্দ হইল! কে করিল? গণ্ডমূর্খ অসভ্য গ্রাম্য ব্রাহ্মণ, আর তার পাথরের মূর্ত্তি ভবতারিণী! ধন্য মূর্খত্ব, ধন্য প্রস্তর মূর্ত্তি! রামকৃষ্ণ! দেবতা আমাদের! বুঝাইয়া দেও—পাষাণে পাষাণই থাকে না; সেখানে চৈতন্যও থাকে পরিপূর্ণরূপে। বৈদেশিক দার্শনিক রম্যাঁ রলাঁর অনুভূতি আসে,—আমাদের আসে না!

অচেতন সচেতন সকল পদার্থের অন্তরেই যদি ঈশ্বরের সত্তা

বিগ্যমান, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই যদি ঈশ্বরের রূপ তবে মানুষেও ঈশ্বরের সত্তা বিগ্যমান আছে, মানুষও ঈশ্বরেরই রূপ। গাছ পাথর নদী যদি পূজার যোগ্য, মানুষও পূজার যোগ্য। গাছ পাথর নদীতে যদি গুণ থাকে, তারা যদি আমাদের উপকারী হয়, তবে মানুষে তো প্রচুর গুণ আছে, মানুষ তো ঢের বেশী উপকারী। পথের পার্শ্বে পতিত প্রস্তর খণ্ড, আকাশের নক্ষত্র দৃশ্যতঃ স্পষ্টতঃ আমাদের কোন উপকার করে কি? কিন্তু মানুষ করে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মানুষ কেন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজার আধার নয়? কে বলে,—নয়? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ; বিধাতার শ্রেষ্ঠ শিল্প মানুষ। মানুষ পূজা পায় না,—কে বলে? রামসীতা, কৃষ্ণরাধিকা, শঙ্কর, ব্যাস, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ কাহাকে না আমরা পূজা করিয়াছি? আর ঘরে ঘরে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, পিতামাতা পুত্রকন্যাকে, পুত্রকন্যা পিতা-মাতাকে, ভ্রাতাভগিনী পরস্পরকে প্রেমভক্তি স্নেহ মমতার বিনিময়ের দ্বারা এই মানব পূজাই নিত্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে না কি? যেখানে পূজা বন্ধ হয় সেখানে বুঝিতে হইবে মানুষের মধ্যে গ্লানির সঞ্চার হইয়াছে—হয় উভয়তঃ, নয় একতঃ। অনুশোচনার দ্বারা, তপশ্চর্য্যার দ্বারা, একাগ্রতার দ্বারা, নিজ কর্ম্মের দ্বারা সেই গ্লানির অপনোদন করা তখন মানুষের কর্ত্তব্য। মানুষ যখন গ্লানি-হীন তখন সে পূজা পাইবেই। ঘরের মানুষ হউক, গ্রামের মানুষ হউক, দেশের মানুষ হউক, পৃথিবীর মানুষ হউক, আপন হউক পর হউক, দূর হউক নিকট হউক যে মানুষ গ্লানিহীন, যে মানুষ

নির্ম্মল সে আমাদের পূজার পাত্র হইবেই। কারণ সে যে ভগবান! সে যে পৃথিবীতে দেবতা! তুমি আমি সকলেই সেই। তত্ত্বমসি! সোঽহম্!

আচ্ছাদন, আবরণ, মলিনতা অপসারণ করিতে পারিতেছি না; পূজাও পাইতেছি না। যে পারে, সেই পায়। সেই বীর। কারলাইল তাকেই বীর বলিয়াছে। কার্‌লাইলের বীর শুধু যোদ্ধাই নয়। কার্‌লাইলের বীর ছয়ভাগে বিভক্ত। ছয় রকমের মানুষকে সে বীর বলিয়াছে। দেবতা, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কবি, পুরোহিত, সাহিত্যিক, এবং রাজা—এই ছয়রকমের মানুষ ছয়রকম বীর। কারলাইল্ দেব-দেবীর উদাহরণের জন্য লইয়াছে স্কাণ্ডিনেভিয়ার পৌরাণিক পুরুষ ওডিন্‌কে; ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের উদাহরণে আরবদেশের হজরত মহম্মদকে; কবির উদাহরণে ইটালির ডান্টে এবং ইংলণ্ডের সেক্ষপীয়রকে; পুরোহিতের উদাহরণে জার্ম্মাণীর লুথার এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের নক্স্‌কে; সাহিত্যিকের উদাহরণে জন্‌সন্, রুশো, ও বায়্‌রন্‌স্‌কে; এবং রাজার উদাহরণে লইয়াছে ক্রম্‌ওয়েল্ ও নেপোলিয়ন্‌কে। মানুষের মত মানুষ ইহারা প্রত্যেকেই বটে। মানবের পূজার যোগ্য আধার বীরমানব।

সকল দেশেই ক্ষুদ্রতম বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠ মানবে গিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে আমাদের পৃথিবীর পূজার অনুষ্ঠান। কারলাইলের উপরে আমাদের একটু সহানুভূতি আসে, একটু করুণা হয়। অত বড় ধার্ম্মিক সাহিত্যিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা যদি তাহার থাকিত তবে সে

তাহার ছয়প্রকারের বীরাদর্শই ভারতবর্ষে ভূরি ভূরি দেখিতে পাইত। তাহার মত সমদর্শী পুরুষ ভারতকে অধীন দেশ মনে করিয়া অবজ্ঞায় পরিহার করিতে পারে না। কারলাইল ভারতের ইতিহাস জানিত না—ইহা বলাই সঙ্গত। কারলাইল্ যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিতও এবং দুইচারি জন ভারতীয় নরনারীকে বীরের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতও, তথাপি তাহার লেখনী একজন বীরপুরুষের বর্ণনায় ধৃত হইত না। কেন না, সে বীর তাহার যুগে অব্যক্ত ছিল। আমাদের যুগের এই বীরকে বর্ণনায় পরিস্ফুট করিতে পারিলে তাহার লেখনী হইত পবিত্র, বীরপূজা হইত সার্থক। সকল বীর হইতেও বীর এই বীর। এই বীরকে আমরা কিরূপে পূজা করিতেছি তাহাই বলিবার জন্য আমার অদ্যকার প্রয়াস। সকল দেশেই ক্ষুদ্রতম বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠ মানবে গিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে আমাদের পৃথিবীর পূজার অনুষ্ঠান। আজ আমাদের এই বীরের পূজাও তাহারই একটা উজ্জ্বল উদাহরণ।

ভারতের আজিকার এই বীর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতবাসী ইহাকে বলে, মহাত্মা গান্ধী। বাল্যকালে বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে মাতার অনুরোধে সন্ন্যাসীর সম্মুখে ইহাকে তিনটী শপথ গ্রহণ করিতে হইল; "মদ্য স্পর্শ করিব না। মাংস স্পর্শ করিব না। নারীর সংস্পর্শে যাইব না।" বিলাতে যাইয়া মাতৃভক্ত বীরবালক সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। যথাকালে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বম্বে ব্যবসায় আরম্ভ করিবা মাত্র এক মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহাকে যাইতে হইল—দক্ষিণ আফ্রিকায়। আর সেই ভূমিতেই

তাঁহার ত্যাগপূত কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল। সেই যে আরম্ভ হইল তাহা আর থামিল না। নানা সময়ে নানা আকারে নানা কর্ম্মে এক অদ্ভুত ত্যাগী কর্ম্মী, গৃহী সন্ন্যাসী পুরুষ প্রকট হইতে লাগিল,—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে ভারতের পুণ্য ভূমিতে অবরূঢ় ঐ পুণ্য তনুখানির মধ্য দিয়া। এসিয়াবাসী, ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আইনের বলে বিতাড়িত হইবে। গৃহহীন নিরন্ন মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? আবার মাথার কর, আইনের বলে! প্রতিবাদ না করিয়া পারে না সে, যার প্রাণ আছে। মৃত্যুর ভয়, পদ প্রহার, কারাবাস কি না সহ্য করিল মানুষের জন্ম মানুষ—ভারত-বাসীর জন্য মহাত্মা গান্ধী? বীরের মত তিনি সব সহ্য করিলেন। প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্সের—নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের—বল পরীক্ষা হইয়া গেল। আবার তত্রত্য সরকারের বিপদে এই মহাত্মাই অগ্রণী হইয়া সাহায্য করিলেন। বুয়ার যুদ্ধে য়্যাম্বুল্যান্স্ কোর স্থাপন করিয়া আহত ব্যক্তির শুশ্রূষায় রত হইলেন। যদি ইংরেজশাসক ভারতবাসীর উন্নতির সহায় হয়! হায়রে, স্বার্থের সংঘাত বড় বিষম সংঘাত!

ব্যক্তিগত আঘাতই তাঁহার জীবনে প্রথম আসিয়াছিল। পরে এই ব্যক্তিগত আঘাতকেই তিনি জাতির প্রতি আঘাত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কথিয়াওয়াড়ে এক ষ্টেটের ইংরেজ কর্ম্মচারি তাহার চাপরাশীকে হুকুম করিল, 'গান্ধীকে আমার ঘর হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেও।' অসম্মানপূর্ব্বক 'এই বাক্য গান্ধীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইল। চাপরাশী গান্ধীকে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিল। নূতন জীবন, সবে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। এ অপমান

তাঁহার অসহ্য। কিন্তু শুনিলেন ওকালতী ক্ষেত্রে যাঁহারা মহারথী হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই এবম্বিধ অপমান পাইয়াছেন এবং তাহা তাঁহারা নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছেন। গুজরাট তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই, বিদেশের আহ্বান তিনি সাদরে বরণ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হন।

কিন্তু অদৃষ্ট যে তাঁহাকে অপমানের মধ্যেই টানিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহা কি তিনি জানিতেন? আর তিনি কি ইহাও জানিতেন যে এই অপমান পরম্পরাই উত্তরকালে তাঁহাকে মহামানের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবে? তিনি জানিতেন যে তিনি ওকালতী ব্যবসায়ের জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় রাস্তাতেই তিনি দেখিলেন, কালো ও ধলা রঙের মানুষের জীবনে বিষম তফাৎ। গাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কালো ভারতবাসী উঠিতেই পারিবে না। পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া কেহ উঠিলেও তাহাকে জোর করিয়া নামাইয়া দেওয়া হয়। তিনিও সে অপমানের অংশী হইলেন। শুধু তাই নয়। এক জায়গায় যখন তাঁহাকে সিগরামে চড়িয়া যাইতে হইয়াছিল তখন একটা গোরা তাঁহাকে ভিতরে বসিতেই দিল না। ড্রাইভারের পাশের সিটে তাঁহাকে বসাইয়া রাখিল। আবার মধ্য পথে যাইয়া সেই গোরারই হাওয়া খাওয়ার দরকার হইলে নামিয়া আসিয়া সে গান্ধীকে উঠিয়া ড্রাইভারের পাদানের উপর বসিতে বলিল ও সে নিজে গান্ধীর স্থানে বসিতে চাইল। গান্ধী এখন আর তাহা সহ্য করিলেন না। গান্ধী নড়িলেন না। গোরা জোর করিয়া তাঁহাকে নামাইতে উদ্যত হইল। গান্ধী একটা

লোহার শিক দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। টানা হ্যাঁচড়া, কিল ঘুষি গান্ধীকে জর্জ্জরিত করিল। গান্ধী স্বীয় পণে অটল।

তাই এক একবার মনে হয় কিল ঘুষি ও লাথি খাইয়াই বুঝি গান্ধী মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন আর আজ মহাত্মা হইয়া আমাদের পূজা লইতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার উপরে যে অন্যায় আচরিত হইয়াছে তাহার জন্য তিনি প্রতিশোধ লইতেন না। কিন্তু তিনি যখনই দেখিতে পাইয়াছেন যে তাঁহার উপরে ব্যক্তিগতভাবে যে অন্যায় আচরিত হইয়াছে সেই অন্যায় তুল্যরূপে জাতির উপরও আচরিত হইয়া থাকে তখনই তিনি তাহার প্রতিকারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি জয়ীও না হইয়াছেন তাহা নয়। তাই, এক বৎসর অন্তে তাঁহার ব্যবসায়ের কার্য্যশেষে তিনি যখন দেশে ফিরিবেন তখন জাতি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিল না। জাতির প্রেম তিনিও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রিটোরিয়া হইতে নামিয়া আসিয়া তিনি ডারবানে আট্‌কা পড়িয়া গেলেন। স্বচ্ছন্দে সে বন্ধন স্বীকার করিয়া তিনি সেই স্থলেই ব্যারিষ্টারী করিতে ও প্রবাসী ভারতবাসীর সেবা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হইল। যে দিন বালাসুন্দরম্‌কে তিনি রক্ষা করিলেন সেই দিন হইতে দলে দলে গির্‌মিটিয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল! গরীব গির্‌মিটিয়াগণের দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আসিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎপীড়িত গির্‌মিটিয়াগণ গান্ধীর মধ্যে একাধারে মা-বাপ, ভাইবন্ধু

দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেস্ও পুষ্ট হইয়া উঠিল।

তিনি তিন বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিবার পর কিছু কালের জন্য দেশে ফিরিলেন। তাঁহার স্ত্রী কস্তুর-বাঈ ও দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ডারবান পুনঃ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জাহাজ হইতে তাঁহাকে তীরে নামিতে দেওয়া হয় না। যদি জোর করিয়া তিনি নামেন তবে তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা। বত্রিশ দিন পরে তীরে নামিবার হুকুম আসিল। কিন্তু কি বিড়ম্বনা!

তিনি নামিতে না নামিতেই চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে পিষিয়া ফেলিতে লাগিল। ইটপাথরও এদিক ওদিক হইতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে কিল ও লাথিতে তিনি অবসন্ন হইলেন। পুলিস্ সুপারিন্টেন্ডেন্টের স্ত্রী মিসেস্ আলেক্-জাণ্ডার তাঁহার ছাতা খুলিয়া গান্ধীর মাথার উপর ধরিয়া সে দিন যদি তাঁহাকে না বাঁচাইতেন তবে সেখানকার ক্ষিপ্ত গোরারা সেই দিনই বোধ হয় তাঁহার জীবনান্ত করিয়া ফেলিত। মানব কল্যাণের জন্য যিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হন তাঁহার জীবননাশের সম্ভাবনা হইলেও এইরূপ যথাকালে রক্ষক বা রক্ষয়িত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়।

বর্ণবৈষম্য দক্ষিণ আফ্রিকায় এত বেশী যে সেখানে কালো-চামড়ার লোকেরা প্রত্যেক রাস্তা দিয়া চলিবারও অধিকারী হইত না। গান্ধী কিন্তু সাদা-চামড়ার রাস্তা দিয়া বিচরণ করিতে ছাড়িত না। ফলে একদিন রাস্তার ধারের একটা বড় বাড়ীর ফটক হইতে

একটা দারোয়ান আসিয়া গান্ধীকে ঘুষি দিয়া ফেলিয়া দিল ও লাথি মারিয়া বিলক্ষণ লাঞ্ছিত করিল। একজন পরিচিত বন্ধু এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল। তাই এক একবার মনে হয়, মার খাইয়াই বুঝি গান্ধী মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু কাথিয়াওয়াড় বা দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যায় তাঁহার মত লাঞ্ছনা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে—কম বা বেশী। কিন্তু অন্তরের সুপ্ত মানবসিংহ এমন করিয়া হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিয়া সমগ্র পৃথিবীটাকে এমন করিয়া কাঁপাইয়া তুলিতে পারিয়াছে কয় জন?

অথচ প্রথম বয়সে গান্ধীতে—তোমাতে, আমাতে ও তোমার আমার পার্শ্ববর্ত্তী বহু লোকের মধ্যে যে সাধারণ জীবন দেখিতে পাই—তাহাই তো দেখিতে পাই। তাহা না হইলে, কস্তুর-বাঈএর সহিত গান্ধীর ব্যবহার আবাল্য ভিন্ন ধরণের হওয়া উচিত ছিল। আজন্ম সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার সহধর্ম্মিণী সারদা দেবীর সহিত বিবাহের পর হইতে দেহাত্যয় পর্য্যন্ত যে শুদ্ধ সংযত মহোচ্চ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন গান্ধীও আবিবাহ কস্তুর-বাঈর সহিত তেমনি ব্যবহার করিয়াছেন বা অনেকটা অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—আমরা এইরূপই আশা করি না কি? রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, ভারতের সহরে সহরে দেখিতে পাই, গান্ধীর প্রতিকৃতিও আমরা আজ পৃথিবীর প্রতি মহাদেশে, প্রতি দেশে, ভারতের প্রতি প্রদেশে, প্রতি জেলায় ও গ্রামে দেখিতে

পাই না কি? প্রতিকৃতির প্রচারবাহুল্যদ্বারা মহত্বের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলে যে গান্ধীর ছবিই আমাদের চক্ষে বড় বলিয়া ভাসিয়া উঠে। এই ভ্রমাত্মক বিচারপদ্ধতি ত্যাগ করিলে যদিও আমরা অন্তর্দ্দর্শী পরমহংসদেবের সমাধিগত অনুভূতির ভাস্বর রশ্মিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই চরণাভিমুখে সমাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই বর্ত্তমান যুগের সকল মানবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিব তথাপি গান্ধীকে তো আমরা ক্ষুদ্র আদর্শরূপে তাঁহার চেয়ে অনেক নিম্নে কখনই বসাইতে পারিব না। মহাত্মা গান্ধী যে সত্যই আমাদের দৃষ্টিতে মহাত্মা! আজ যিনি জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা, আজ যিনি পৃথিবীর কোনও কোনও সাধু খৃষ্টভক্তের নিকটে যীশুর তিরোভাবের পরে যীশুরই তুল্য একমাত্র দ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া সম্মানিত তিনিই সে দিন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ওকালতীর জীবনে যখন সপরিবার বাস করিতেছিলেন তখন কস্তুর-বাঈএর সহিত অমন অসমুচিত ব্যবহার কিরূপে করিতে পারিয়াছিলেন? যে সাধ্বী নারী তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার মত ক্লেশবহুল স্থানে গমন করিয়াছিলেন সেই নারীকে তখনও তিনি ভোগের সামগ্রীরূপেই ভাবিতেন। মহাত্মা তখনও ভালরূপে জানিতেন না পত্নী সহধর্ম্মিণী, সহচারিণী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, সকল সুখদুঃখের অংশভাগিণী। তিনি জানিতেন, স্বামী পত্নীর প্রভু ও উপভোক্তা! ভাগ্য-ক্রমে সরলপ্রাণে এই মহাত্মা নিজের দোষ নিজেই বিবৃত করিয়াছেন।

ডারবানের সেই গৃহে সেই বিদেশে গান্ধী রুদ্রমূর্ত্তিতে রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আমার গৃহে এ রকম বকমারি চলিবে

না।' পত্নী কস্তুর-বাঈ অমনি সমানে উত্তর দিলেন, 'তবে তোমার গৃহ তোমার থাক, আমিও এ রকম গৃহে থাকিতে চাই না।'

ক্রুদ্ধ স্বামীর আর হিতাহিত বিবেচনা রহিল না। অবিলম্বে তিনি স্ত্রীর উপরে গিয়া আক্রমণোন্মুখ বিক্রমে আপতিত হইলেন। কস্তুর-বাঈ তখন হাতে বাসন লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। তদবস্থায় গান্ধী তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। হিড় হিড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া টানিয়া নামাইয়া তাঁহাকে বহির্গমনের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। দরজার অর্দ্ধেক খুলিলেন। সত্যই স্বামী তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন দেখিয়া কস্তুর-বাঈ লজ্জায় দুঃখে বলিলেন, 'এ কি করিতেছ? তুমি যে একেবারেই জ্ঞান হারাইয়াছ! তোমাকে ছাড়িয়া তোমার গৃহ ছাড়িয়া এই পরিচয়হীন দক্ষিণ আফ্রিকার কোন্ স্থানে আমি যাইব? এখানে কি আমার মাবাপ আছে যে আমি তাঁহাদের আশ্রয়ে যাইয়া উপস্থিত হইব? আর লোকেই বা বলিবে কি? তোমার ত এতটুকুও লজ্জা নাই; কিন্তু আমার লজ্জা আছে।'

গান্ধীর চেতনা হইল। স্ত্রী যাহা বলিতেছেন, সত্যই তো তাহা অনুপেক্ষণীয়। উভয়ে বাড়ীর ভিতরে ফিরিয়া গেলেন। কস্তুর-বাঈএর জয় হইল। কস্তুর-বাঈ তাঁহার সহিষ্ণুতাগুণের দ্বারা অনেকবারই স্বামীকে জয় করিয়াছেন।

নারী যে গৃহে সম্মানিত হয়, নারীর সন্তোষ যে গৃহে অটুট থাকে সেই গৃহে লক্ষ্মী বিরাজমানা থাকেন। দেবগণের আশীর্ব্বাদ

সেই গৃহে বর্ষিত হয়। সেই গৃহের উন্নতি হয়। এরূপ উক্তি আর্য্যগণের বচনে আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিণীর প্রতি যে ব্যবহার শাস্ত্রবিহিত তাহা গৌরবময় ও কল্যাণপ্রদ। দম্পতীর পবিত্র প্রেম গৃহস্থিতির ভিত্তি ও পরমোজ্জল কল্যাণমণিনিচয়ের আকর। সে প্রেম যখন একমাত্র কামভোগ-পর্য্যবসানের দ্বারা দুষ্ট হইতে চলে তখন তাহাই আবার পরিণামে নানা অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা সব সময় গভীরভাবে এ সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। তাই আমাদের অনর্থেরও অন্ত নাই।

মহাপুরুষগণ আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া পথ দেখাইলে আমরা অনর্থজাত হইতে মুক্ত হইতে পারি। তাই আমরা মহাপুরুষগণের জীবন পর্য্যালোচনা করি আর সৎপথের সন্ধান করি। সন্ধানের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মহদ্দৃষ্টান্ত যখন আমাদের চোখে পড়ে তখন আমরা আনন্দ অনুভব করি ও অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাহা অনুসরণ করিতে আমরা পারিব কেন? সে যে অভ্রংলিহ তুঙ্গ হিমবৎশৃঙ্গের অভ্রস্পর্শী আদর্শ! দুর্ব্বল দেহে ও ততোধিক দুর্ব্বল মনে তত উচ্চে আরোহণের ক্ষমতা তো আমাদের নাই। প্রাকৃত মানবের প্রাকৃত আদর্শ চাই। তাই, মহাত্মা গান্ধী আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ। তিনি তাঁহার জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার ব্যবহারের দ্বারা দেখাইয়াছেন তিনি আমাদেরই মত একজন ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে ও প্রাকৃত মানবের ব্যবহারে প্রভেদ বড় কমই ছিল। সেই সাধারণ অবস্থা হইতেই তিনি তাঁহার জীবনকে উন্নত করিয়াছেন

আর আজ মহাত্মা হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন—এ কথা যখন বুঝিতে পারি তখন আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। আমরা ভাবি, আমাদের সাধারণ জীবনও তবে উন্নতির যোগ্য! আমরাও চেষ্টা করিলে তাঁহারই মত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিতে পারি।

তাঁহার জীবনারম্ভে তাঁহার স্ত্রীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার 'আত্ম-কথায়' এমন স্পষ্টরূপে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিয়া আমরা তাঁহাকে এত সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করি যে তিনি কখন আমাদের সাধারণ মানুষদেরও অনেকের চেয়ে অধিকতর সাধারণ বলিয়া প্রতীয়মান হন। মনে হয় যেন আমরাও তাঁহার চেয়ে অধিক জ্ঞানী, অধিক বুদ্ধিমান!

আমাদের অনেকেই জানে পত্নী আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে আমাদের অঙ্গের সম্পূর্ণতা দান করিয়া থাকে। পত্নী ব্যতীত আমাদের অঙ্গ অপূর্ণ; অর্দ্ধমাত্র। অর্দ্ধনারীশ্বররূপে ভগবান শিব আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়া থাকেন। পত্নী আমাদের দেহের অর্দ্ধ—এ শুধু ভারতের আর্য্যগণই বলেন না। ইউরোপ আমেরিকার সভ্য মানবও এই কথাই বলে। তাহারাও পত্নীকে 'হাফ্' বলে! কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহারা আমাদের চেয়েও এক কাঠি উপরে উঠিয়া পত্নীকে তাহারা "বেটার্ হাফ্" বলে। 'বেটার হাফ্' মানে উৎকৃষ্টতর অর্দ্ধ। পত্নী অর্দ্ধ তো বটেই; পাশ্চাত্য মতে পত্নী শ্রেষ্ঠার্দ্ধ। তাই এই অর্দ্ধাঙ্গিনীর উপরে অন্যায় প্রভুত্ব পরিচালনা করিবার তো আমাদের কোন অধিকারই নাই। নারী তো নরেরই অর্দ্ধাঙ্গ, সমান। প্রভুত্বের অবকাশ এখানে কোথায়?

আবার আমরা জানি পত্নী আমাদের সহধর্ম্মিণী। পত্নী আমাদের ধর্ম্মসাধনের সহায়। আমরা জীবনে ধর্ম্মের সাধনা করিব। আর পত্নী সেই সাধনার সহায় হইবে। ধর্ম্মপত্নীকে পার্শ্বে রাখিয়া পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। একত্র একাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুনির্দ্দেশক্রমে পতি-পত্নী ঈশ্বর ধ্যানে নিবিষ্ট হইবে। ধ্যান ও পূজার অবসানে পরিবারস্থ গুরুজনগণের সেবা করিবে; স্নেহভাজন ও নিম্ন জনগণের পরিপালন করিবে। পরিবারস্থ প্রত্যেকের সুখ সুবিধা ও মঙ্গলের বিধান করিয়া নিজ নিজ সুখসাধনে প্রয়াসী হইবে। গৃহী আতিথ্য পালন করিবে, প্রতিবেশীর তুষ্টি সম্পাদন করিবে, 'পঞ্চ যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করিবে। আমরা শ্রীরামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞসাধনার সংবাদ রাখি। তাহাতে মুখ্যা পত্নীর কত বড় অংশ গ্রহণ করিতে হয় তাহাও জানি। সাবিত্রীর ব্রতপালন ও যমের নিকট হইতে পিতা, শ্বশুর ও স্বামীর নিমিত্ত বরলাভের বিষয়ও জানি। কত কিই যে আমরা জানি! আমাদের মাথাগুলোতে তত্ত্ব আর জ্ঞানের সমাচারেরা মিলিয়া ভিড় করিয়া বসিয়াছে, দিনরাত কত গজ গজ করিতেছে!

আমরা জানি, পত্নী আমাদের 'মা'ও বটে। কথাটা একটু আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। যার তার মুখে যখন তখন পত্নীকে মা বলা শোভাও পায় না, সত্য। কিন্তু পত্নী যখন অন্নের থালা হস্তে পতিকে পরিবেশন করিতে আসেন এবং রন্ধনশালার যাবতীয় শ্রেষ্ঠ আহার্য্য পতির পাতে নিঃশেষে দান করিয়া দিয়া পতিকে খাওয়াইয়া পতিরই তৃপ্তিতে নিজে পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেন, এবং নিজের আহারের জন্য সামান্য যা' হউক কিছু রাখিয়া দেন

তখন পত্নীকে মা বলিব না ত কি বলিব? মায়েরই মত যে পত্নী তখন ত্যাগ ও প্রীতির মূর্ত্তিমতী দেবী। তবুও পত্নীকে সাধারণতঃ মাতৃরূপে কল্পনা না করাই ভাল। কি জানি, আমরা যদি মায়ের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া বসি। অতি উচ্চগ্রামে মন প্রতিষ্ঠিত না হইলে পত্নীতে মাতৃকল্পনা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া পড়ে। ভাবটা তখনই সমঞ্জস হয় যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবভূমিতে আমরা সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করিতে সমর্থ হই। আর তখনই পত্নীর চরণে 'ষোড়শী পূজা'ও সার্থক হয়।

আমরা আরও জানি, পত্নী আমাদের সখী। পত্নীকে সখীভাবে গ্রহণ করিতে সারা জগৎই জানে; পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আরও ভাল জানে। দেখিতে পাই, ওরা স্বামীস্ত্রীতে যুগলে যুগলে কেমন সুন্দর চলা ফেরা করে। বাহুতে বাহু মিলাইয়া একে অপরকে বাহুবাহুপাশের সহিত আন্তরপ্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়া কেমন স্বচ্ছন্দগতিতে মনের আনন্দে নৃত্যের ভঙ্গিতে পথ দিয়া চলিয়া যাইতে থাকে! স্বামীস্ত্রী সখাসখী। গভীর বন্ধুত্ব, প্রাণের প্রগাঢ় মিল। ভাল নয় কি? নিশ্চয় ভাল, নিঃসন্দেহ মনোরম, —যদি খাঁটি হয়, যদি নিষ্কলুষ হয়। ভারতবাসীও সে লীলার মধুর আস্বাদ না জানে তা নয়। সে যখন দুর্ব্বল হইয়াছে; অধীন হইয়াছে; লুণ্ঠনকারী, আক্রমকারী, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নজাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে তখনই সে ঐরূপ মধুরভাবের সখীভাবের স্বাধীন রস-সম্ভোগ বর্জ্জন করিয়া আবরণের অন্তরালে গোপনবাসের শরণ লইয়াছে। স্বাধীন ভাব তার নাই; কিন্তু সখীভাব সে

জানে। গৃহেরই অভ্যন্তরে স্বামী তার স্ত্রীর সহিত, স্ত্রী তার স্বামীর সহিত নানা রঙ্গে বিবিধ ঢঙ্গে কত খেলাই না খেলে! মন্দ কি? বেশ তো। যতদিন এমনি নিরাবিলভাবে সে দম্পতী কাটাইতে পারে ততই তো ভাল। কিন্তু পারে কি সে বেশীদিন? কেন পারে না? সেই তো কথা! সেই জন্যই তো গান্ধীর জীবন পর্য্যালোচনার দরকার হয়।

আর আমরা জানি, স্বামী স্ত্রীর গুরু। আমাদের স্ত্রীরা কথায় কথায় শিক্ষা পায়—পতি পরম গুরু। সুতরাং পত্নী তার স্বামীর নিকটে হয় শিষ্যা, নয় ছাত্রী, নয় তো দাসী। স্বামী যদি জ্ঞানবান সাধক হয় তবে তাঁর স্ত্রী তাঁর শিষ্যা হইতেই পারে; আর তা হইলে উভয়ের সংযোগে পরম কল্যাণই লাভ হইয়া থাকে। স্বামী যদি শিক্ষিত হয় তবে স্বল্পশিক্ষাসম্পন্না স্ত্রী স্বামীর ছাত্রী হইবে—ইহাতে বিচিত্রতা কি? বরং ইহা ভালই।

কিন্তু স্ত্রী যে স্বামীর দাসী—এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকে নানা দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা দরকার। স্বামী গুরু বা প্রভু, আর স্ত্রী সেবিকা বা দাসী;—এই ভাব ন্যায়ানুমোদিত না অন্যায় এবং ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োগই বা কিরূপ ছিল এবং এখন কেমন হইয়াছে? এই কথাটা বুঝিতে হইলে, আমাদের বিচারের সূক্ষ্ম দৃষ্টি যে কয়টা বিষয়ের উপরে নিক্ষেপ করিতে হইবে তাহা হইতেছে এই দেশের স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা, বহুকালাচরিত পরিপার্শ্বস্থ প্রথা, শারীর শক্তির প্রভেদ এবং প্রকৃতিবিহিত অঙ্গ-বৈষম্য ও অঙ্গ-বিকাশ-বৈচিত্র্য। প্রভুত্ব বা দাসীত্ব নির্দ্ধারণে

এই কয়েকটী বিষয়ই তুল্য-গুরুত্ব-বিশিষ্ট ও প্রকৃষ্টরূপে বিচার্য্য। কিন্তু এস্থল তো সে বিচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রধান প্রসঙ্গ যে দূরে সরিয়া পড়িবে! তবুও এতৎসম্পর্কে দুইচারিটি কথা না বলিলে চলে কি করিয়া? দেশেরই কল্যাণের জন্য এ বিষয়টা প্রসঙ্গোত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই একবার একটু ভাবিয়া লইতে হইবে বৈ কি।

নারীর শিক্ষা ও জ্ঞান সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই পুরুষের চেয়ে কম। যে কালে বা যে দেশে নারীশিক্ষার সুব্যবস্থা ও বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায় সে কালে ও সে দেশেও তুলনামূলকবিচারে দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষিত নারীর সংখ্যা শিক্ষিত নরের চেয়ে কম। পৃথিবীতে শিক্ষার প্রচার দ্বারা যাঁহারা জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন তাঁহারা কেহই নারী নহেন। আদি কবি, আদি সাহিত্যিক, আদি বৈয়াকরণ—সকলেই নর। মধ্য যুগে বা বর্ত্তমান যুগেও তত্তৎক্ষেত্রে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনীষা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাও নর। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, বা হোমার্, ড্যাণ্টে, শেক্স্পীয়ার প্রভৃতি লোক-শিক্ষকগণ নরমনীষার গৌরব এত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে নারীমনীষা চিরদিনই ইহার নিকট মাথা নত করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এ কথাও বোধ হয় ভবিষ্যদ্বানীরূপে বলা যায় যে নারী চিরদিন নরের নিকট এ জন্য মাথা নত করিবেই। বৈজ্ঞানিক জগতেও ঠিক এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু এই যে নরের মাথা লুণ্ঠিত হইল ইহারই সুযোগ লইয়া কি নর প্রভু, ও নারী দাসী হইল? হইল বৈ কি! স্বেচ্ছাক্রমে ভক্তির বশে এই যে দাসীত্ব ইহাতে

আত্মসম্মানের অপচয় তো নাই; বরং বৃদ্ধি আছে। নারী শিক্ষিতা; নর ততোধিক শিক্ষিত;—নারী আনন্দের সহিত দাসীত্বের বন্ধন স্বীকার করে; ভক্তি সে বন্ধনের সূত্র। নারীর প্রাণ নরকে প্রভুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু নর সে প্রভুত্বের অপব্যবহার করিতে পারে না। পারিবে কেন?—সে যে শিক্ষিত, বিবেকবান্। নারী অশিক্ষিতা; নর শিক্ষিত;—সেখানেও নারী আনন্দের সহিত দাসীত্বের বন্ধন স্বীকার করে, ভক্তি সে বন্ধনের সূত্র। নারীর প্রাণ নরকে প্রভুর পদে প্রতিষ্ঠিত করে। নর সে প্রভুত্বের অপব্যবহার করে না। কেন করিবে? সে তো শিক্ষিত। শিক্ষা আর ভক্তির রমণে প্রেমের জন্ম লাভ হয়। যখন প্রেমের জন্ম হইল তখন নারীই শুধু দাসী নয়, নরও হয় দাস। নর যদি নারীর দাসত্বের কল্পনা না করিতে পারিত তবে ভবভূতি শ্রীরামচন্দ্রকে '(সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা) দেবি, দেবি, অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ'—(সীতার চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া) দেবি, দেবি, রামের মস্তকের দ্বারা তোমার পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর পদদ্বয়ের এই শেষ স্পর্শ—এবম্বিধ বাক্যে রোরুদ্যমান দেখিত না। কালিদাসও শকুন্তলানাটকের পরিশেষে গিয়া স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর চরণ স্পর্শ করাইত না। গুরু যদি শিষ্যার চরণস্পর্শ করে তবে শিষ্যার পাপ হয়; প্রভু যদি দাসীর চরণ স্পর্শ করে তবে তাহাও অসঙ্গত আচরণ হয়। কিন্তু আমরা শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়ের শ্রেষ্ঠনাটকে দেখিতে পাই যে কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও কারণে স্বামীই স্ত্রীর চরণে প্রণত। তাই বলি, স্ত্রী যে স্থলে দাসী হয়,

স্বামীও সে স্থলে দাস হইয়া থাকে। এই পরস্পরের সেবাবৃত্তির মধ্যে পরস্পরের পূজার প্রতিষ্ঠা হয়। স্বামী স্ত্রীকে পূজা করে; স্ত্রী স্বামীকে পূজা করে। ঘনিষ্ঠ প্রেমের দ্বারা পরিচালিত এই পূজা যখন পরিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে তখনই হয় জীবনের সার্থকতা। এই মানবপূজাই শেষে পরমার্থের সন্ধান মিলাইয়া দেয়।

কিন্তু আমরা ভুল করিয়া বসি। কেন? উত্তর,—শিক্ষার অভাব, পুরুষের মূর্খতা। মূর্খ পুরুষ তার স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার বলে যে দাম্ভিকতা মনের মধ্যে পোষণ করিবার সুযোগ পায় তাহারই ফলে সে স্ত্রীর পরমপ্রভু হইয়া স্ত্রীকে একমাত্র দাসী-বৃত্তিতেই নিযুক্ত রাখিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে নিতান্ত হীন করিয়া দেয়।

সমাজব্যবস্থা এরূপস্থলে স্ত্রীর উপর স্বামীর অবৈধ একাধিপত্যের অনুকূল থাকিয়া পুরুষের যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয় এবং নারীর দেহ ও মনের পীড়ায় একান্ত উদাসীন থাকে। ইউরোপ আমেরিকার মত এদেশে পত্নী বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে না। যে পত্নী পতিত্যাগিনী হয় সে সমাজের চক্ষে ঘৃণ্যা। সে যদি স্বৈরিণী না হয় তবে তাহার জীবন দুর্ব্বহ; আর স্বৈরিণী হইলে সে হয় নিরয়গামিনী; সে দাঁড়ায় কোথায়? তার চিত্তে যদি এতটুকুও পবিত্রতা থাকে তবে তাহাকে অশিক্ষিত ও অত্যাচারী পতিরই দাসীবৃত্তি করিয়া যাবজ্জীবন নিগৃহীত হইতে হয়। পক্ষান্তরে পতির পক্ষে পত্নীত্যাগ সহজ এবং পত্ন্যন্তর গ্রহণ সম্ভব। তাই, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পতিকে করে দাম্ভিক ও

অসমুচিত-প্রভুত্ব-বোধ-সম্পন্ন। এবং এই কারণেই বিবেকহীন মূর্খ পতি প্রায়শঃই উৎপীড়নকারী স্বামী হয়।

বর্ণ সঙ্কর দোষ নিবারণের জন্য ও অন্য অনেকগুলি সূক্ষ্ম কারণ ও বিচারের ফলে ভারতের এই সমাজ ব্যবস্থা। ঋষি-প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থা অশেষ কল্যাণই উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠানই কালে কালে কোন কোন দিক দিয়া দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। তার জন্য ঋষির দোষ নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনেই দোষ। মানুষ যখন স্বভাবতঃ সৎ হয় বা শিক্ষিত হয় তখন সমাজে যে দোষ না আসিতে পারে, সেই দোষই তুল্যব্যবস্থান্বিত সমাজে আসিয়া পড়ে তখন যখন মানুষ স্বভাবতঃ অসৎ বা শিক্ষাবিহীন। আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব হইয়াছে অনেক দিন হইতে। এই বিংশশতাব্দীর বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও বিশাল ভারতে শিক্ষিতজন-সংখ্যার শতকরা হার নিতান্ত অতৃপ্তিপ্রদ। অশিক্ষিত পুরুষ বংশ-পরম্পরাক্রমে তাহার পরিপার্শ্বে দেখিয়া আসিতেছে যে স্বামী তার স্ত্রীর সার্ব্বভৌম অধীশ্বর। প্রাণেশ্বরী, জীবিতেশ্বরী, হৃদয়বল্লভা প্রভৃতি কথার কথা মাত্র; কিন্তু প্রাণেশ্বর, জীবিতেশ্বর প্রভৃতি কথা অক্ষরশঃ সত্য বা বাধ্যতামূলক সত্য! অহো বিপর্য্যয়। অহো নির্য্যাতিতা নারীজাতি! অহো পাশববৃত্তিপরায়ণ ভারতনর-কুল! অহো দুর্দ্দৈব, অজ্ঞান!

নারী যে পুরুষের দাসী বলিয়া পরিগণিত হয় তাহার আরও কারণ আছে। নারী সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে দুর্ব্বলা, শরীর-শক্তিতে হীনা। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের প্রভাব চিরপ্রথিত।

জন্মাবধি নারী ও নরে যে অঙ্গবৈষম্য দেখা যায় তাহা দ্বারাও আদিকাল হইতে ইহাই সূচিত হইয়া আসিতেছে যে গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিতে হইলে নারীকে নরের অধীন হইতে হইবে। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য। ইহার ভিতরে সত্যের পূর্ণতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অঙ্গবৈষম্যবশতঃ নারীই নরের অধীনা হয়, নর নারীর শরণাপন্ন হয় না—এ কথা তো জোর করিয়া বলা যায় না। যে শৃঙ্গাররসোপলব্ধিতে এই বৈষম্যের সার্থকতা তাহার প্রয়োজন উভয়েরই সমান, আকর্ষণ উভয়েরই সমান, তৃপ্তি উভয়েরই সমান। সুতরাং এই ভাবের বিচারের দ্বারা একজন প্রভু ও অন্য জন দাসী ইহা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। তবুও এই সমন্বেব মধ্যেও নারীর নিম্নস্থান একেবারে অস্বীকারও তো করা যায় না। তাই নর বিবেচনা করে সেই প্রভু। কিন্তু এখানেও মানবের প্রতি মানবের পূজার ভাব থাকা চাই। যদি না থাকে তবে তার অবশ্যম্ভাবী ফল ধ্বংস।

অঙ্গবিকাশবৈচিত্র্য নারীকেই নর অপেক্ষা অধিক শোভন করে। ষোড়শী যুবতীর পীন স্তন ও প্রচুর প্রলম্বিত কেশরাশি, তাহার চন্দ্র-মুখ, চরণপদ্ম, নবনীতকোমল বাহুপাশ কবির লেখনীকে যেমন চিরকালই নৈপুণ্যময়ী করিয়াছে, কামীজনের চিত্তকেও তেমনি উত্তেজিত করিয়াছে। এই বিকাশবৈচিত্র্যে নারীই শ্রেষ্ঠ। নারীই প্রভু; নর তার সেবক। নারী ভোগের সামগ্রী কেন? এই বিকাশবৈচিত্র্যেই তো! এই কমনীয় দেহ সম্পদের অধিকারিণী বলিয়াই তো সে নরের আকাঙ্ক্ষিতা! তাই যদি, তবে তো সে

দাসী নয়! সেই প্রভু। যে সম্পদের বলে সে নরকে আকর্ষণ করে, প্রীতি দান করে সেই সম্পদ, সেই কামিনীশ্রীই তো নরের প্রভু। সে যদি প্রভুই না হইবে তবে নর কেন তাহার অধীন হইতে যায়, কেন সে তাহাকে বাদ দিয়া তাহার জীবন চালায় না? সে যদি কিঙ্করীর ন্যায় আজ্ঞাপালনকারিণী সামান্যা নারীই হইবে তবে স্বামী কেন তাহাকে নিজের শয্যায়, সমান শয্যায় স্থান দেয়, কেন তাহার জন্য কুসুমশোভিত সুবাসসিক্ত মনোরম শয্যার রচনা করিয়া তাহার প্রীতি সম্পাদনের দ্বারা নিজে প্রীতি অনুভব করিতে এত যত্নবান হয়? ইহা কি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অর্ঘ্যদান নয়, ইহা কি নরের দ্বারা নারীর পূজা নয়, ইহা কি নারীরই প্রভুত্ব নয়? যদি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বিচার করিয়া নারীর অধীশ্বরীত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে নর কেন আমাদের সমাজব্যবস্থার ও নারীর শারীরিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে যখন বিবাহের পরে স্বায়ত্তা দেখে তখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ মনোবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া যথেচ্ছচারিতার পরিচয় দেয়? যেমন অশিক্ষা ও কুশিক্ষা ইহার জন্য দায়ী তেমনি বাল্যবিবাহও অনিয়ন্ত্রিতাবস্থায় ইহার জন্য দায়ী। আর এই অন্যায় আচরণের জন্য দায়ী—নরের দারিদ্র্য, অভাব।

আরও কারণ আছে যে জন্য পুরুষ স্ত্রীর উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চায়। পুরুষ যদি দুর্ব্বল হয়, নারী যদি সবলা সুপুষ্টা হয়, তবে সেই পুরুষনারীর বিবাহ বন্ধন সুখকর হয় না। স্ত্রী বীর্য্যবান স্বামীরই অনুরাগিণী হয়। স্বামী দুর্ব্বল হইলে স্ত্রীর সন্তোষ হইবে কেন? দুর্ব্বল পুরুষের সহিত সবলা নারীর বিবাহই অসঙ্গত!

উভয়েরই অন্তরস্থিত * ভগবানেরও পূজা হইয়া থাকে। 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।' * * * 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।'* স্বামী ও স্ত্রী কখনও একে অন্যের হৃদয়ে, কখনও নিজে নিজের হৃদয়ে—সেই পুরুষোত্তমকেই দর্শন করে, পুলকবিহ্বল হইয়া রোমাঞ্চকলেবরে তাঁহারই পূজা করে। মানবপূজার এইখানেই সার্থকতা, আবার মানব-পূজার এইখানেই আরম্ভ।

আমরা জানি এত তত্ত্ব। আমাদের এত জ্ঞান। বোধ হয় মহাত্মা গান্ধীও এত খবর রাখেন না। তবুও তিনিই মহাত্মা, আমরা দীনাত্মা। তিনি জগৎপূজ্য, আমরা ধিক্কৃত! কেন? কেনর জবাব,—জানায় আর আচরণে অনেক তফাৎ আছে! রামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে,—'শকুনি আকাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়, কিন্তু তার নজর থাকে গো-ভাগারের দিকে। তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা বলে, লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, কিন্তু তাহার মন থাকে রূপরসাদি বিষয়ের দিকে।' কিন্তু সাধক যে, সে শুধু কথাই বলে না, হয়তো অনেক কথা জানেই না, সে শুধু স্থিরলক্ষ্য হইয়া সাধনার মার্গেই অগ্রসর হইয়া থাকে। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক, তিনি আমাদের যুগাবতার।

এই গান্ধী যৌবনে স্ত্রীর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সাধারণ মানুষেরই ন্যায়। ভোগের আসক্তি ও প্রভুত্বের অহঙ্কার তাঁহারও ছিল। রামকৃষ্ণের ন্যায় আজন্ম নিষ্কামপুরুষ তিনি নন,

---

* গীতা ১৫শ অঃ, ১৫শ শ্লোঃ। গীতা ১৮ শ অঃ, ৬১ শ্লোঃ।

বিবেকানন্দের মত চিরব্রহ্মচর্য্যপূত জীবন তাঁহার নয়। না হইয়া ভালই হইয়াছে,—গৃহী একটা আদর্শনের সন্ধান পায়। মানুষ তাঁহার অনুকরণ করিয়া বড় হইবার সুযোগ পায়।

তিনি অনুকরণযোগ্য,—না! কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই সহজ নয়। এমন কি, সেই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি কস্তুর-বাঈকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তার মধ্যে শুধু দোষই আছে এমন নয়। তারও আর একটা দিক আছে। সেটা তাঁহার সাধনারই দিক। গৃহের সমস্ত উচ্ছিষ্ট বাসনপত্র কস্তুর-বাইকে সাফ করিতে হইত। অথচ তাঁহার গৃহে তাঁহার কেরাণীরাও বাস করিত। কেরাণীদের মধ্যে হিন্দু খৃষ্টান্ বা গুজ্‌রাটী ও মাদ্রাজী সকল শ্রেণীর লোকই থাকিত। বস্তুতঃ গান্ধী কোন দিনই মনে মনেও হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে কোন যথার্থ ভেদ আছে বলিয়া মনে করেন না। এ বিষয়ে বিবাট-মানবতা-পূজার একটা সহজাত সংস্কার তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার কেরাণীদেরও বাসনপত্র মাজিয়া লওয়া না হয় কস্তুর-বাঈএর সহ্য হইল। উকিল বা ব্যারিষ্টারের স্ত্রী অবশ্যই ইহা সহ্য করিতে পারে না। স্বামীর আদেশে তিনি না হয় তাহা সহ্যই করিলেন! কিন্তু আরও কঠিন কার্য্য। বাড়ীতে নর্দ্দমা না থাকায় সকলে পাত্রে প্রস্রাব করিত; সেই প্রস্রাব, সেই পাত্রও সাফ করিবার ভার ব্যারিষ্টারের আর ব্যারিষ্টার-পত্নীর! সংসারবাসনাবতী পতিপদাঙ্কানুসরণকারিণী কস্তুর-বাঈকে সবই করিতে হইল। কিন্তু মনে তাঁহার অসন্তোষ রহিয়া গেল; চক্ষে তাঁহার জল। ইহাও দমন করিতে তিনি বোধ হয় সমর্থা হইতেন, যদি একটি 'পঞ্চম' অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর নবাগত কেরাণীর প্রস্রাব

সাফের কার্য্যও তাঁহাকে না করিতে হইত। হায়রে, কঠিন মানব-পূজা-ব্রত! যে মানবপূজায় সিদ্ধকাম হয় তাকেই সারা দুনিয়ার মানব পূজা করে। গান্ধীকে আমরা সাধ করিয়া পূজা করি? গান্ধীই আমাদিগকে আগে পূজা করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন; তাই এখন আমরা তাঁহাকে পূজা করিতেছি।

তাই বলিতেছিলাম, তিনি আমাদের অনুকরণযোগ্য আদর্শ হইলেও অনুকরণটা বড়ই সহজ নয়। ঐ যে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে পত্নীর প্রতি বাল্যকালে (গান্ধী ও কস্তুর-বাঈ বাল্যবিবাহের দম্পতী) ও প্রথম যৌবনে তাঁহার সকামভাব ও মোহ ছিল তাহাতেই আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে তিনি আমাদেরই মত প্রাকৃত মানব। হাঁ, তাই বটে; তিনি তাই ছিলেন। শুধু চরিত্রের দিক দিয়া নয়; বুদ্ধির দিক দিয়াও তাই। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, কিন্তু কলেজপাঠ্য কঠিন বোধে পড়া ছাড়িয়া দিলেন। বিলাতেও লণ্ডন-ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বারে ফেল করিয়া দ্বিতীয়বারে তিনি পাশ করেন। বোম্বাইএ ওকালতী আরম্ভ করিয়া কোর্টে দাঁড়াইয়া নিজ-অক্ষমতা-বোধে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের 'কেস্' ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়েন, ওকালতী ছাড়িয়া কাথিয়াওয়ারে পালাইয়া যান। সেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, সেই সাধারণ একজন গুজরাটী আজ ভারত-প্রখ্যাত জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা গান্ধী! প্রাকৃতই ছিলেন তিনি,—আজ অপ্রাকৃত, অতি-মানব! অনুকরণ করার আদর্শও বটে; কিন্তু অনুকরণ করা বড় সহজও নয়।

ঐ যে মোহময়ঃ কামময় বালক,—সে আজ কত বড় ব্রহ্মচারী,

কেমন ইন্দ্রিয়জয়ী! ভাবিতেও বিস্ময় হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটা পরিবর্ত্তনের সাড়া তাঁহার অন্তরে আসিয়াছিল। কিন্তু সন্তাননিয়ন্ত্রণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরে এই সাড়া তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইতে চলিল, 'জুলু বিদ্রোহের' সময় তিনি যখন আহত জুলুদিগকে বহন করিয়া জনশূন্য স্থানের উপর দিয়া মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া যাইতেন, তখন। তিনি চিন্তা করিতেন, তাঁহার জীবনে মানবসেবার এইরূপ প্রয়োজন আরও উপস্থিত হইবে। মানবের সেবা যদি তাঁহাকে করিতেই হয়, তবে সে সেবায় তাঁহার শক্তির প্রয়োজন হইবে। শক্তি কোথা হইতে আসে? ব্রহ্মচর্য্যই সকল শক্তির মূল। ক্রমশঃ তাঁহার ধারণা দৃঢ় হইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্রত লইলেন। কি কঠোর ব্রত! যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য! যে আজন্ম নিষ্কাম নয় সেও তবে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থ! আশার সঞ্চার হয়,—কিন্তু কঠিন। এই কাঠিন্যকেও সেই মহাপুরুষ অতিক্রম করিতেছেন! সাতাশ বৎসর তো ব্রতের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইল! ঐ আমাদের চতুঃষষ্টি বর্ষ বয়সের বৃদ্ধ মহাত্মা! ধন্য পুরুষপ্রবর, স্বাগতম্!

তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ কেন করে ভারতবর্ষ, জান? ভারতবর্ষের বীত ঋষিদের চরণের নখাগ্র স্পর্শ করিবার যোগ্য তুমি নও। তোমার কি জ্ঞান, কি বুদ্ধি, কি দৃষ্টি, কি শক্তি আছে? তুলনায়, কিছুই নাই। তবুও, আজ ভারতবর্ষ তোমারই চরণনখাগ্র স্পর্শ করিতে ব্যাকুল! কেন এমন? ভারতের সে ব্রহ্মচর্য্য, সে সংসার, সে তপশ্চর্য্যা, সে সন্ন্যাস নাই। সব হারাইয়া ভারত এখন দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ,

হীনতার পঙ্কে মগ্ন। স্বেচ্ছায় সে নিজকে হীন করিয়া এই দুরবস্থাকে বরণ করিয়াছে। যখন এই অবস্থা তাহার অসহ্য হইয়াছে তখন সে 'ত্রাহি, ত্রাহি চীৎকার করিয়াও পথ পাইতেছে না। নিজের শক্তির অনুভূতি আসিতেছে না। এই নিঃসহায় অবস্থায় ভারত দেখিল, কে একজন পুরুষ ভারতের শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ রাজশক্তি 'গভর্ণর জেনারল ও ভাইসরয়ের' সম্মুখে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী আস্ফালন পূর্ব্বক বলিতেছে, আমার আত্মার শক্তির বিরুদ্ধে তোমার জান্তব শক্তি কি করিতে পারে (What can your brute force do against my soul force)? ভারতবর্ষের চৈতন্য হইল; আত্মশক্তির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে সে মোহনদাস করমচাঁদকে চিনিয়া লইল। ভারত তাহার চীৎকার থামাইয়া আবেদন নিবেদন বন্ধ করিয়া, মোহন দাসের অনুসরণ করিতে লাগিল।

কিন্তু পারিবে কেন? ব্রহ্মচর্য্য কোথায়? আত্মশক্তি যে ব্রহ্মচর্য্যেরই স্ফুরণ! তাই, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন আমাদের উপরে মহাত্মার আদেশ হইল, এই এক বৎসর আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইবে, তখন আমরা প্রমাদ গণিলাম। হায়রে, একটা বৎসরেরও ব্রহ্মচর্য্য আমাদের নিকটে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। যিনি জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্রমান্বয়ে বহুবর্ষ সেই ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন তাঁহার পক্ষে দেশবাসীকে স্বরাজলাভার্থ 'অহিংস অসহযোগ' সাধনায় একবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আহ্বান করা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ তো সেই ঋষির ভারতবর্ষ নাই। কথায়ই বলে, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও

নাই। তবুও আমরা নাকি সেই ঋষিরই সন্তান! গর্ব্বটুকু তো বেশ রাখি!

মহাত্মাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তাঁহার ত্যাগ ও সংযমের জীবন সর্ব্বদিক হইতে দেখিতে হইবে। তবে তাঁহার পথে চলা যদি সম্ভব হয়। আহার সংযমও তাঁহার জীবনের একটা মস্ত বড় অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে। খাদ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা—কোন্ খাদ্য বর্জ্জনীয়, কোন্ খাদ্য গ্রাহ্য, এই বিষয়ে বিচার করা—বাল্যকাল হইতেই তাঁহার একটি কাজ। বৈষ্ণব পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিরামিষ খাদ্য গ্রহণই তাঁহাদের কৌলিক প্রথারূপে বাল্যকালে দেখিতে পান। এক বলিষ্ঠ বাল্যবন্ধুর পরামর্শে তিনি মাংসাহারের শ্রেষ্ঠত্ব কিয়ৎকালের জন্য মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাতৃভক্ত বালক মাতার নিকটে মদ্যমাংস ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়া যখন বিলাত গমন করিলেন তখন হইতেই খাদ্য নির্ব্বাচন তাঁহার জীবনের একটি মহা সমস্যা ও কর্ত্তব্য হয়। তিনি যখন লণ্ডনে একদিন ঘটনাক্রমে নিরামিষ-আহার-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী একটি সমিতি দেখিতে পাইলেন তখন হইতে তাঁহার বিলাতে অনুভূত খাদ্যবিষয়ক প্রাথমিক কষ্টের অবসান হয়। তিনি ঐ সমিতির সদস্যও হন, শেষে নিজেও এক নিরামিষাহারপ্রচারক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য সেখানে তাঁহার সমিতি বহুকালস্থায়ী হয় নাই।

খাদ্যের পরিবর্ত্তন আফ্রিকাতেই তাঁহাকে বিশেষভাবে করিতে হয়। প্রিটোরিয়াতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এবং পরে জোহানেস্‌বার্গে গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের ফলে আফ্রিকাতেই

একদিকে যেমন তাঁহার ধর্ম্মজীবনের জাগরণ হয়, অন্যদিকে তেমনি সেই দেশে মানবসেবার কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার মধ্যে সংযম বুদ্ধি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়। এই সংযমের প্রধান কার্য্য যেমন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন তেমনি দ্বিতীয় কার্য্য হইতেছে খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচন।

কস্তুর-বাঈএর অসুখ উপলক্ষে তাঁহাকে সাময়িকভাবে খাদ্যের কতকগুলি পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। অসুখের জন্য কস্তুর-বাঈএর ডাল ও নূন ত্যাগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্ত্রীকে এই দুইটি খাদ্য ত্যাগ করাণের জন্য গান্ধী মনে করিলেন যে এই বিষয়ে স্বামীরও স্ত্রীকে আদর্শ দেখান দরকার। গান্ধীও ডাল এবং লবণ ত্যাগ করিলেন। পতিপত্নী উভয়েই ডাল এবং লবণ ত্যাগ করিলেন। পত্নীর জন্য পতির এ ত্যাগ গান্ধীজীবনে সত্যাগ্রহের এক মধুর স্মৃতি। যত দিন যাইতে লাগিল ততই গান্ধী ব্রহ্মচার্য্যর দৃষ্টিতে কঠোরতর খাদ্যসংযমনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দুধ ত্যাগ করিলেন। বোম্বাইবাসী তাঁহার এক ধর্ম্মপরায়ণ বন্ধু রায়চাঁদ ভাই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, দুধ ইন্দ্রিয়বিকারকারী বস্তু। নিরামিষ সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তকেও তিনি সেই মতের সমর্থন পান। সেই সময়ে কলিকাতা হইতে কিছু সাহিত্য তাঁহার নিকট যায়। তাহাতে তিনি গরুমহিষের উপর 'ফুকা' করা হয় জানিয়া দুধ খাওয়ার বিরুদ্ধে মনে ধিক্কার অনুভব করেন। গরু মহিষের প্রতি এই প্রাণঘাতী কষ্ট তাঁহার অসহ্য বোধ হয়। তাঁহার মিত্র মিঃ কলেন্‌বেকের সহিত আলোচনার ফলে, কলেন্‌বেক্ এই বিষয়ে গান্ধীকে প্ররোচিত করেন। ১৯১২ সালে টলষ্টয় ফার্ম্মে গান্ধী দুধ ত্যাগ করিলেন।

শুধু দুগ্ধ ত্যাগ করিয়াই তিনি বিরত হইলেন না। দুগ্ধ-ত্যাগের অল্পকাল পরে, তিনি কেবল মাত্র ফলাহার করিয়া জীবন ধারণ করিবেন এই সঙ্কল্প করেন। কাঁচা মুগফলী, কলা, খেজুর ও জলপাইএর তেল তাঁহার সাধারণ খাদ্য হইল। ফলাহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপবাসও সংযোগ করিয়া দিলেন। আমরা অনেকে একাদশী প্রভৃতি উপলক্ষে উপবাস করি, ফলমূল খাইয়া। এই হিসাবে গান্ধী তো প্রত্যহই উপবাস করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি এখন উপবাস ব্রতকালে নির্জ্জল উপবাস আরম্ভ করেন।

যাহা হউক, উত্তরকালে ভারতবর্ষে, রাউলাট্ কমিটির রিপোর্ট প্রচারিত হইবার কিছু পূর্ব্বে, তিনি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন। সেই সময় ডাক্তারের নির্দ্দেশে ও পত্নীর ইচ্ছায় দুগ্ধ পরিত্যাগের চিরসঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে তিনি বাধ্য হন। অবশ্য গরু বা মহিষের দুগ্ধপানে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কারণ, তাহাতে অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যাইত। গরু মহিষের কষ্টই তো তাঁহার দুগ্ধ-ত্যাগের একটি কারণ ছিল। সময়ের ফেরে, অগত্যা, গান্ধী ছাগলের দুগ্ধপানে সম্মতি দিলেন।

গান্ধীর এই সমস্ত খাদ্য পরিবর্ত্তন বিষয়ে আমাদের দেশের শাস্ত্রের প্রভাব খুব কমই আছে। তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র বিচারের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই খাদ্যত্যাগ ও খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশবাসীকে সর্ব্বথা গান্ধীর অনুসরণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বরং, আমি তো নিজে আমার শাস্ত্রনির্ভরশীল-বিচারের দ্বারা এ বিষয়ে গান্ধীকে ভ্রান্তই বলিতে চাই। যে দুগ্ধকে

তিনি ইন্দ্রিয়বিকারকারী পরিহর্ত্তব্য খাদ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন সেই দুগ্ধই ভারতীয় আর্য্যের পবিত্রতম খাদ্য সমূহের মধ্যে একতম্। দুগ্ধ, ঘৃত, দধি না হইলে বেদমার্গানুগামী হিন্দুর কোন পবিত্র ক্রিয়াই সম্পন্ন হয় না। হিন্দুর হোম বন্ধ হয়; তাহার দেবদেবীর পূজায় অঙ্গহানি হয়। দুগ্ধ ব্যতীত তাহার সত্যনারায়ণপূজার প্রধানতম নৈবেদ্য ও প্রসাদ প্রস্তুত হইতে পারে না। পঞ্চগব্য না হইলে তাহার শুদ্ধি হয় না। দধি ঘৃতাদির অভাবে কোন বড় নিমন্ত্রণ দোষযুক্ত রহিয়া যায়; অতিথিসৎকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং দুগ্ধ পরিহর্ত্তব্য খাদ্য হইতেই পারে না। দুগ্ধ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে—এ কথাও আমরা মোটেই স্বীকার করিতে পারি না। তাহা যদি হইত তবে আমাদের বিধবাদের জন্য দুগ্ধ নিষিদ্ধ খাদ্য হইত। আমরা বিচার করিয়া দেখিতে পাই বিধবার সমস্তগুলি খাদ্যই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যদমনকারী। যে খাদ্যই উত্তেজক তাহাই বিধবার জন্য নিষিদ্ধ। যতির খাদ্য আর বিধবার খাদ্য এক;—ইহাই 'স্মৃতির' বিধান। যতি ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য। দুগ্ধ বিধবার তো নিষিদ্ধ খাদ্য নয়ই, বরং বিহিত। সুতরাং দুগ্ধ ব্রহ্মচর্য্যসাধক। ভারতের ঋষিগণ দুগ্ধঘৃতের উপর নির্ভর করিয়াই ঋষিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা না হইলে ঋষিত্ব অর্জ্জিত হইতে পারে না। ঋষির আশ্রমে, ব্রাহ্মণের গৃহে দুগ্ধের প্রচুর ব্যবহার ফলমূলব্যবহারেরই তুল্য স্থান অধিকার করিত। প্রচুর দুগ্ধের অত্যাবশ্যকতাই গো-জাতিকে দেবতার পদে, মাতার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। কামধেনু, নন্দিনী হিন্দুপুরাণের অতুল্য সম্পদ্। ঋষির আশ্রমে ও ব্রাহ্মণের গৃহে গোমাতার অবিদ্যমানতা

নিন্দার বিষয়। গোমাতার সেবা করা ইহাদের ছিল কর্ত্তব্য। গোমাতার প্রতি ব্রাহ্মণের সেবাভাব দেখিয়া ক্ষত্রিয়রাজগণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে গো-দান একটা পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। দেব-পূজার দিক দিয়া এবং স্বাস্থ্যোন্নতির দিক দিয়া দুগ্ধ অত্যাবশ্যক ছিল। একটা জাতিসৃষ্টিরই প্রয়োজন হইল, শুধু এই গোমাতার রক্ষণের জন্য। উচ্চ ত্রিজাতির মধ্যে বৈশ্য এক জাতি। এই বৈশ্য জাতির প্রধান কর্ত্তব্যনিচয়ের মধ্যে অন্যতম কর্ত্তব্য গোপালন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে লেখা আছে, 'কৃষিগোরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।' পরে গোপনামক এক শাখাজাতির একমাত্র কর্ত্তব্যই হয় গোচার্য্য। আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত গরুর এত যত্ন কেন? দুগ্ধের প্রয়োজনেই তো। দুগ্ধ প্রাচীন যুগেও অনাবশ্যক পদার্থ ছিল না, আজও নয়। সকল পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর এবং দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা সহজপাচ্য—এই কথা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পালন করিতে বাধ্য—এই হিসাবে সত্যের পূজককে আমরা কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করাই তাঁহার অন্যায় হইয়াছিল। এ অন্যায়ও তাঁহার অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার গোমহিষাদির উপর অত্যাচারও দুগ্ধত্যাগের কারণ হইতে পারে না, অছিলা মাত্র। পূর্ব্ব হইতেই দুগ্ধের অপকারিতার ভাব মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পরে গো-মহিষাদির প্রতি উৎপীড়নের অছিলায় দুগ্ধ পরিত্যক্ত হইল। উৎপীড়ন যখন হয় তখন উৎপীড়ন নিবারণই দরকার হয়। দুগ্ধ-

ত্যাগ দরকার হয় না। যদি বলা যায় যে যাহারা উৎপীড়ন করিতেছে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুগ্ধ পরিত্যাগ করা হইল তবে উত্তর দেওয়া যায় যে একের পাপে অন্যের প্রায়শ্চিত্ত একটু বিসদৃশ এবং এই প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্ত্তে প্রতীকারের চেষ্টাই সঙ্গততর। অবশ্য এরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিসদৃশ হইলেও ইহার একটা ফল এই হয় যে যদি মহাত্মার প্রতি উৎপীড়ন-কারিগণের প্রেম থাকে তবে ঐ প্রেমবশে উৎপীড়কগণ মহাত্মার প্রতি সানুকম্প হইয়া উৎপীড়ন বন্ধ করিবে। কিন্তু গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং উৎপীড়ন যখন কলিকাতায় বা তত্তুল্য দূরবর্ত্তী স্থানে সেইকালে গান্ধী ও তদ্বিধ উৎপীড়কের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল না। আর উৎপীড়নও সত্যই কি প্রকার এবং প্রয়োজন হইলে সেরূপ উৎপীড়ন কর্ত্তব্য হয় কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ আমরা জানি সংসারে এমন সব কাজ আছে যাহা আপাততঃ ক্লেশকর অথচ পরিণামে মঙ্গল। 'অগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্'—অনেক কিছুই সংসারে থাকিতে পারে। অগ্রপশ্চাৎ সর্ব্বকালেই যাহা বিষবৎ তাহাই ত্যাজ্য। এইরূপে, গোমহিষাদির উপরে যে ব্যবহারের জন্য গান্ধী দুগ্ধ ত্যাগ করেন সে ব্যবহার যদি 'অগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্' হয় তবে তজ্জন্য গান্ধীর প্রায়শ্চিত্ত বা দুগ্ধত্যাগ কোনটারই দরকার হয় না। যদি উক্ত ব্যবহার অগ্রে ও পরিণামে সর্ব্বকালেই বিষোপম হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা প্রতীকারই অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত। উৎপীড়কদের উপরে তাঁহার যদি তখন কোন হাত না ছিল, তবে তিনি

আফ্রিকায় তাঁহার যে টলষ্টয় ফার্মে দুগ্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থলেই দুগ্ধত্যাগের পরিবর্ত্তে গোমাতার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিতেন। তাঁহার সেই আশ্রম গো-সেবার জন্য আরও পবিত্র হইয়া উঠিত। জীবে দয়া আরও অধিকতর প্রস্ফুট হইত। যে গো-ক্ষুরোত্থিত ধূলি পর্য্যন্ত পবিত্রজ্ঞান করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ তদ্দারা আপ্লুত হওয়াকে একপ্রকার স্নান বলিয়া গণ্য করিতেন সেই গোক্ষুরোত্থধূলিধূসর হইয়া তাঁহার আশ্রম অধিক শোভাসম্পন্ন হইত। শত শত পরিপুষ্ট সযত্নপালিত গাভীর দুগ্ধ ও আশীর্ব্বাদ যুগপৎ তাঁহাকে দেহোন্নতি ও আত্মোন্নতি দানে সহায়তা করিত। হায় রায়চাঁদ ভাই, হায় ইংরেজী কেতাব, তোমরা আমাদের মহাত্মাকে কেন ভুল পথে চালিত করিলে ?

কৃচ্ছ্রসাধ্য তপশ্চর্য্যাই যদি ত্যাগের কারণ হয় তবে আমরা মহাত্মাকে দোষী করিতে পারি না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব তপস্বীদের কেহ কেহ আহার সংযম করিতে গিয়া একের পর এক করিয়া খাদ্যোপকরণসংখ্যা কমাইয়া ফেলিতেন। অন্ন ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ ধরিতেন, দুগ্ধ ত্যাগ করিয়া ফল ধরিতেন, ফল ত্যাগ করিয়া পত্রাশী হইতেন, পর্ণত্যাগান্তে বায়ুভুক্ হইয়া তপস্যাচরণে দেহ নিয়োগ করিতেন। পুরাণে লেখা আছে, অতীত যুগে অনিলমাত্রাহারী হইয়া তপস্বিগণ বহুকাল প্রাণধারণে সমর্থ হইতেন। কিন্তু কলিযুগে মানুষ অন্নগত-প্রাণ। এখন বাতাস খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাহা না পারিলেও কেহ যদি সত্যপরীক্ষায় ব্রতী হইয়া দেখে যে সে কতদূর কমখাদ্যে জীবন ধারণ করিতে পারে তবে সেই সাধককে

—বা আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগের ভাষায়, সেই অদ্ভুত বৈজ্ঞানিককে—বিস্ময়মিশ্র প্রশংসা না দিয়া পারি না। জিহ্বার উপর আশ্চর্য্য আধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। উগ্র তপস্যার কঠোরতায় সে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর দুগ্ধত্যাগের কারণ ত শুধু তপস্যাই নয়। দুগ্ধ উত্তেজক; গো-মহিষাদির উপর অত্যাচার করা হয়;—দুগ্ধত্যাগের এবম্বিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই মহাত্মা আমাদিগকে তাঁহার কার্য্য সমালোচনায় প্ররোচিত করিয়াছেন। কারণ তিনি আদর্শ পুরুষ। লোকে তাঁহাকে অনুকরণ করিবে, এমন সম্ভাবনা আছে। কেননা,—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

গীতা ৩।২১

একমাত্র কঠোর তপস্যাচরণই যদি দুগ্ধত্যাগের কারণ না হয় তবে দুগ্ধত্যাগ অসমুচিত;—অবশ্য, রোগিবিশেষে চিকিৎসকের নিষেধ থাকিলে, দুগ্ধত্যাগ কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু সেরকম ক্ষেত্র অত্যন্ত কম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুগ্ধ রোগীরও পথ্য। আরও বলা যায়, দুগ্ধ ও দুগ্ধসঞ্জাত পুষ্টিকর খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়াই অতীত যুগের ব্রাহ্মণ-গণ তপস্যার শক্তি অর্জ্জন করিতেন এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণগণ উৎকৃষ্ট গব্য ভোজ্যের উপর নির্ভর করিয়াই শারীরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। আমাদের বর্ত্তমান অবনতির কারণপরম্পরার মধ্যে গোমাতার পূজায় বিরতি অন্যতম। গোজাতির কল্যাণের জন্য আমাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়া ভগবানের

প্রণাম মন্ত্র গভীরভাবে ধ্যান করিতে করিতে ভগবানকে একাগ্রচিত্তে প্রণাম করা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

দুগ্ধত্যাগ সম্পর্কে গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেও, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে ব্রহ্মচর্য্যপালনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি কঠোর আহারসংযমে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু; ত্যাগ অসাধারণ। এই সাধু, এই ত্যাগী দুই একটি কার্য্যে ভুল করিলেও আমাদের বরেণ্য না হইয়াই পারেন না। ভুল তো হইবেই—'সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' ধূম ছাড়া তো অগ্নি থাকে না! কিন্তু অগ্নি আমাদের বরেণ্য; তার তেজে আমাদের প্রয়োজন আছে, ধূমে নাই।

গান্ধীর তেজে আমাদের প্রয়োজন নাই? আছে কি না তার উত্তরের জন্য আমাদিগকে তাঁহার সেবাব্রতের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে হইবে। গান্ধী আবাল্য সেবক। সেবাব্রত তাঁহার সহজাত সংস্কার। বালক গান্ধীকে আমরা দেখি, তিনি পিতার সেবায়, মাতার আদেশপালনে নিযুক্ত। ভগন্দর রোগে পিতা ভুগিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র মোহনদাস তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। কি মধুর দৃশ্য! ভক্তির কি সুন্দর ছবি! অধিক রাত্রি হইল। পিতা বলিলেন, যাও মোহনদাস, শোও গে। পুত্র ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন—পত্নী কস্তুর-বাঈএর কক্ষে।

মাতৃবাক্যপালনে অনুরক্তি ও দৃঢ়তার আভাস আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। বিলাতে অন্যস্ত্রীসংসর্গ এড়াইতে তাঁহাকে একেবারেই

বেগ পাইতে হয় নাই, এমন নয়। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় মাতৃভক্তির বলে এ বিষয়েও তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

মাতাপিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল। ভক্তিভাবের দ্বারা সেবাভাবের বিকাশ সম্ভব হয়,—হইয়াও ছিল। ইংরেজীতে কথা আছে, Charity begins at home—দাতব্যভাব, সেবাভাব গৃহেই আরম্ভ হয়। যাহার সেবাপরায়ণতা গৃহে আন্তরিক ভাবে বিকাশ পাইতে পারে, তাহার সেইভাব সমগ্র দেশেও বিস্তৃতি লাভ করে। মোহনদাসের বাল্যকালের এই ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের সেবাশীলতা উত্তর-কালে জগন্ময় ব্যপ্তি লাভ করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার যে জনসেবার আরম্ভ হয় তাহার আভাস আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। এখন দেখিতে চেষ্টা কবিব, তিনি ভারতে আমাদের কি হিতসাধন করিয়াছেন।

সেবারম্ভের পূর্ব্বে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান জননায়কগণের সঙ্গে পরিচিত হইতে থাকেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তাঁহার এক কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। দুই একজন লোক তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেও, অধিকাংশ নেতৃবর্গই তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে তিনি যে দুই একবার ভারতে আসিয়াছিলেন সেই সময়েই ভারতের প্রধান পুরুষগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। ফিরোজ শা মেহতা, তিলক, গোখলে, রাণাডে প্রভৃতিই ইঁহাদের মধ্যে প্রধান।

ফিরোজ শা মেহতা বোম্বাইএর সিংহ। তাঁহার বাদসাহী চাল। লোকমান্য তিলক শাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত। গান্ধী বলিয়াছেন, ফিরোজ

শাহ যেন হিমালয়, তাতে আরোহণ করা দুষ্কর; লোকমান্য যেন সমুদ্র, তার অন্ত পাওয়া যায় না, তল পাওয়া যায় না। কিন্তু গোখলে পতিতপাবনী গঙ্গা; যে কেহ তাহাতে স্নান করিয়া ধন্য হইতে পারে, সাঁতার কাটিতে পারে, এপার ওপার যাইতে পারে। গোখলের সম্বন্ধে গান্ধীর এই উক্তি যথার্থই হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে একমাস কাল গোখলে গান্ধীকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন এবং গান্ধীকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অন্তে তিনি যখন বিলাত গিয়াছিলেন তখনও গান্ধী তথায় গোখলের সহানুভূতিতে মুগ্ধ হন। সেখানে গান্ধী মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। কিন্তু ট্রেনিং ক্যাম্পে অবস্থান কালে তাঁহারা যে কর্ম্মচারীর অধীন হইয়া কাওয়াজ শিখিতেছিলেন তাহার হঠকারিতায় বিরক্ত হইয়া এবং অবশেষে গান্ধী স্বয়ং প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হইয়া, যখন গান্ধী ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন তখনও গোখলেই প্রথম তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। গোখলে গান্ধীর পূর্ব্বেই ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়াছিলেন। চিরকালের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া এইবার গান্ধী ভারতে বসিলেন।

তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার বহনের জন্য গোখলে নিজে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে অভয় দান করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া গান্ধীপরিবার কিছু দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে বাস বরিয়াছিল। পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে যখন আহমেদাবাদে গান্ধীর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল তখন গান্ধী পরিবার এইখানে চলিয়া আসে। প্রথমতঃ ২৫ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষ লইয়া এই আশ্রম

আরম্ভ হয়। তাঁহার আশ্রমের নাম হয় সত্যাগ্রহাশ্রম। সত্যের প্রতি আগ্রহই এই নামের কারণ। যখন এই আশ্রমের অভ্যন্তরে এক অস্পৃশ্যজাতীয় পরিবার—'দুদা ভাই, তাহার পত্নী দানীবহিন এবং এক রত্তি মেয়ে লক্ষ্মী'—আশ্রয় লাভ করিল তখন আশ্রমের ভিতরে এবং আশ্রমের বাহিরে সর্ব্বত্রই এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গান্ধী এই বিপত্তি সহ্য করিয়া যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন আজ আমরা সমগ্র ভারতে তাহারই গৌরব দেখিতে পাইতেছি। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে সর্ব্ববর্ণের একাকার হইবার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী এখনও হইতে পারি নাই; কখনও হইতে পারিব কিনা জানি না। তবুও গান্ধীর এই অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনকার্য্যে কেন যেন বিদ্বেষবুদ্ধিও পোষণ করিতে পারি না। গুণকর্ম্মাদি অনুসারে 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্' যে দেশের কথা সেই দেশেই 'শুনি চৈব শ্বপাকে চ' সমদর্শী হইবার কথা আছে। আবার যে দেশে বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন সেই দেশে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যকেও আসিতে হইয়াছিল। তাই আমার বিশ্বাস এই সমন্বয়ের ভূমিতে চাতুর্ব্বর্ণ্যও থাকিবে; আবার মাত্রাতিরিক্ত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেও অভিযান করিতে হইবে।

ভারতে মানবসেবা সম্পর্কে তাঁহার বহুকার্য্যেরই উল্লেখ করা যায়। কিন্তু আমি এখানে মাত্র দুই একটি কার্য্যেরই উল্লেখ করিব। ট্রেন ভ্রমণকালে তিনি বিরামগামে যাত্রীদের অসুবিধার কথা জানিতে পারেন। সেখানে 'কাষ্টমসের' তদন্ত হইত অর্থাৎ কোনও লোক কোনও দ্রব্যের শুল্ক না দিয়া লইয়া যায় কিনা তাহার তদন্ত হইত। ইহাতে যাত্রীদিগকে অকারণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। গান্ধী

প্রথমে বঙ্গে গভর্ণর্ লর্ড্ উইলিংডন্ ও পরে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড্ চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত পত্রের আদান প্রদান ও সাক্ষাৎকার দ্বারা বিরামগামের শুল্কগণ্ডী উঠাইয়া দেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা হইয়াছিল। সেখানেও সেবা-কার্য্যের জন্য তিনি শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহার 'ফিনিক্সের' দল লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই বিরাট মেলায় অনেক প্রকার সেবাকার্য্যেরই প্রয়োজন হয়। লোকের পায়খানার জন্য গর্ত্ত খোদাই করিয়া উহা সাফ করাও নানা সেবাকার্য্যের মধ্যে একপ্রকার সেবা। আমাদের মহাত্মা গান্ধী পায়খানা সাফ করার সেবাই নিজের দলের জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের কৃষকদের যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সেবা তিনি করিয়াছেন তাহার মধ্যে চম্পারণের সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন লক্ষ্ণৌ হাসভায় গিয়াছিলেন তখন রাজকুমার শুক্ল নামে চম্পারণের একজন কৃষক তাহার উকীল ব্রজকিশোর বাবুর সঙ্গে গান্ধীর পরিচয় করাইয়া দেয়।

নীলকর প্রভুদের জন্য শতবর্ষ যাবৎ চম্পারণে একটা প্রথা হইয়া আসিতেছিল যে চম্পারণের কৃষকগণ নিজ নিজ অধিকৃত জমির প্রতি বিঘার তিন কাঠায় নীলের চাষ করিবে। এই তিন কাঠা জমি আলাদা করিয়া রাখার প্রথাকে 'তিন কাঠিয়া' বলা হইত।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার শুক্লের সহিত গান্ধী পাটনায় উপস্থিত হন। সেখান হইতে তিনি মজঃফরপুরে আচার্য্য কৃপলানীর নিকট যাইয়া তৎকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতেই কার্য্যের

গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত হন। একদল উকীলও গান্ধীকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হয়। ব্রজকিশোর বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গান্ধীকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্থিরবুদ্ধি ব্রজকিশোর বাবু কৃষকদের সকল অবস্থা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

কৃষকদের দুরবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইলে শত শত কৃষকদের সহিত সাক্ষাৎ করা দরকার। সেই কার্য্যের পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী নীল মালিকদের সেক্রেটারীর নিকট, এবং কমিশানারের নিকট পত্র দিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। নীলমালিক-দের সেক্রেটারী তাঁহাকে অগ্রাহ্য ভাবের সহিত উত্তর দিলেন। কমিশানার তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ধমকাইয়া ত্রিহুত ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন।

বিহারে ত্রিহুত একটি বিভাগ। এই বিভাগের অধীন চম্পারণ একটা জেলা। চম্পারণের প্রধান নগর মতিহারী। বেত্তিয়ার নিকটে রাজকুমার শুক্লের বাড়ী। এই সব স্থানের কৃষকেরা বড়ই গরীব। রাজকুমার শুক্ল গান্ধীকে এই সব স্থান দেখানের জন্য লইয়া আসিল। মতিহারীতে গোরক্ষ বাবুর বাড়ীতে গান্ধী উঠিলেন। গোরক্ষ বাবুর বাড়ী যেন ধর্ম্মশালায় পরিণত হইল। যে দিন গান্ধী মতিহারী পৌছেন সেই দিনই মতিহারী হইতে কয়েক মাইল দূরে এক কৃষকের উপর অত্যাচার হইয়াছিল। হস্তী-আরোহণে কয়েক জন সঙ্গীসহ মহাত্মা সেই স্থানে চলিলেন। মধ্যপথে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের লোক আসিয়া তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে চম্পারণ পরিত্যাগ করার নোটিশ দিল। মহাত্মা সে আদেশ অমান্য করিলেন।

সুতরাং পরদিন সেই অপরাধে তাঁহাকে কোর্টে উপস্থিত হওয়ার সমন দেওয়া হইল।

সমনের কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইল। সে দিন এক দৃশ্য। গোরক্ষ বাবুর বাড়ী ও কোর্ট্ লোকে পরিপূর্ণ হইল। এ দিকে গান্ধীর দৃঢ়তাসমন্বিত অথচ বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে ম্যাজিষ্ট্রেট্, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ প্রভৃতির সহিত তাঁহার কতকটা সদ্ভাব হইয়া গেল।

মোকদ্দমা লইয়া সরকারী উকীল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি একটু মুস্কিলেই পড়িলেন। মোকদ্দমা মুলতুবী রাখা হইল। গান্ধী ভাইসরয় এবং মদনমোহন মালব্যকে তত্রত্য অবস্থা জানাইয়া তার করিলেন। শাস্তিগ্রহণ নিমিত্ত আদালতে যাওয়ার পূর্ব্বেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ জানাইলেন যে গভর্ণরের আদেশে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল। পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার অনুসন্ধান কার্য্য তো চালাইতে পারিবেনই; প্রয়োজন হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদেরও সাহায্য লইতে পারিবেন—ইহাও জানিতে পারিলেন।

নীলকরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা ব্রজকিশোর বাবুর নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে ব্রজকিশোর বাবুর প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াই গেল।

দলে দলে কৃষকেরা নিজেদের দুঃখের কথা লিখাইয়া দিতে আসিল। লোকের জবানবন্দী লিখিবার জন্য পাঁচ সাত জন লোক নিযুক্ত হইল। জবানবন্দী লেখকগণ, প্রত্যেক কৃষককে জেরা করিয়া, যাহার কথা জেরায় টিকিত, তাহার কথা লিখিয়া লইতে লাগিল। এই সময় দুই একজন ডিটেক্‌টিভ পুলিশও উপস্থিত থাকিত। তাহার ফল ভালই

হইল ; লোকেরা ভয়ের সহিত কথা বলিত ; অসত্য কথা বলিত না ; যাহা সত্য ঘটনা তাহাই লিখিত হইল। দীর্ঘ-অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

অবশেষে গভর্ণর সার এডোয়ার্ড্ গেইট্ গান্ধীকে আহ্বান করিলেন। তিনি নিজে একটা সভা গঠন করিয়া অনুসন্ধান চালাইতে এবং সেই সভায় গান্ধীকে সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাই হইল। ন্যায় ও দৃঢ়তার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া, অনুসন্ধানসমিতির বিবরণ অনুসারে গভর্ণর কৃষকদের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। নীলকরদের অবৈধভাবে গৃহীত টাকার নির্দ্দিষ্ট অংশ ফেরৎ দেওয়া হইল! 'তিন কাঠিয়া' প্রথা উঠিয়া গেল। এইরূপে শতবর্ষ হইতে প্রচলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত নীলকররাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

গান্ধীর আর একটা কার্য্য খেড়ায় সত্যাগ্রহ। সেখানে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা হয়। লোকেদের খাজনা দিতে কষ্ট হয়। তাই, নির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য খাজনা আদায় বন্ধ রাখিতে সরকারের নিকট দরখাস্ত করা হয়। তাহাতে সফল না হইয়া লোকেরা গান্ধীর পরিচালনায় খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া সরকারের দেওয়া সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইল। সরকারের আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গান্ধী এই সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। কাজেই, শেষে সরকার ন্যায়সঙ্গত ঘোষণা-দ্বারা প্রজাদিগকে খুসী করিয়াছিলেন।

এই সব হইল গান্ধীর প্রত্যক্ষ জনসেবা। প্রত্যক্ষভাবে তিনি আরও অনেক সেবা ভারতমাতার জন্য করিয়াছেন। রাউলাট্ বিলের প্রতিবাদ, জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান, নিখিল-ভারত-

জাতীয়-মহাসভার নেতৃত্ব, অহিংস-অসহযোগ-প্রচার, চরখা ও খাদি আন্দোলন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জনসেবা এত আধুনিক ও সর্ব্বজনবিদিত যে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহান্ কার্য্যাবলীর আলোচনা আমি এখন করিব না; করিবার যোগ্যতাও নাই; কেন না, এই সমস্ত কার্য্যের প্রত্যেকটী বিষয় লইয়া এক এক খানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ জনসেবা ছাড়া অপ্রত্যক্ষ সেবাও তিনি আমাদের করিয়াছেন। মানুষ নানা ভাবে মানুষের সেবা করিতে পারে। একজন শুশ্রূষাকারী একজন রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি দিয়া, মাথায় বাতাস করিয়া, গা-হাত-পায়ে হাত বুলাইয়া যখন সেবা করে তখন সে রোগীর প্রত্যক্ষ সেবা করে। কিন্তু সে যখন দূরে সরিয়া নির্জ্জনে বসিয়া রোগীর প্রতি প্রাণের টানে মনে মনে তাহার কুশল চিন্তা করিয়া ভগবানের নিকটে একান্তভাবে আরোগ্য প্রার্থনা করে তখনও সে রোগীর সেবা করে। যদিও সে সেবা রোগীর প্রত্যক্ষ হয় না, তথাপি তাহাও সেবা। এই অপ্রত্যক্ষ সেবাও উপেক্ষণীয় নহে। ইহা আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ সেবা দান করিতে জানে না, সে যদি তাহার শুভচিন্তাদ্বারা অপরের সেবা করে তবে তাহাতে অপরের তো কল্যাণ হয়ই, নিজেরও আত্মোৎকর্ষ হয়। আমাদের নিজেদের চিন্তারাশিকে নির্ম্মল করা ও মঙ্গলময় করাও আমাদের একটি বড় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের মধ্যে মানবপূজাও লুক্কায়িত থাকে। নির্জ্জন গৃহে, নিভৃত প্রান্তরে, দূরবনাভ্যন্তরে, দুরারোহ-গিরিগহ্বরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে সমস্ত মহাপুরুষ নিত্য নীরবে

তাঁহাদের হৃদয়ের শুভকামনা আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করিতেছেন তাঁহাদের সেই অনবদ্য কামনা ভগবানের আশীর্ব্বাদপূত হইয়া আসিয়া আমাদের কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, কেমন অজ্ঞাত অপূর্ব্ব ভাবে আমাদের জাগৃতি দান করিতেছে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। তাঁহাদের নিভৃতবাস, তাঁহাদের মৌন এমনি করিয়াই শুদ্ধ চিন্তাযোগে আমাদের কল্যাণ করে, সেবা করে, পূজা করে।

জনসম্পর্কহীন জীবনও এইরূপে কল্যাণপ্রদ হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীও মৌনদ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে আত্মকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু চিন্তাদ্বারা সেবা করা ছাড়া চিন্তা গ্রন্থবদ্ধ করিয়াও মানবসেবা করা যায়। সদ্‌গ্রন্থের লেখকগণও এই ভাবে মানবের সেবা করিয়া থাকে। তাঁহাদের সচ্চিন্তা, তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষা দিয়া থাকে। এ ভাবেও মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীতে নরনারায়ণের পূজা করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ান্' নামক সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইবার পরে তাহা মহাত্মা গান্ধীরই কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে। ১৯০৪ সালে ফিনিক্সে তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিয়া তিনি 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ান্‌কে' তথায় লইয়া যান। এই পত্রিকার দ্বারা তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সেবাকার্য্য সুন্দররূপে চালাইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়াও তিনি অপর দুইখানি সংবাদপত্র পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন। এই দুইখানি—'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'। এই দুইখানি পত্রিকার সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষে তাঁহার মত ও ভাব প্রচার করিয়া ভারত-বাসীর সেবা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী একজন শক্তিমান লেখক।

তাঁহার লেখনীর শক্তিই প্রধানতঃ তাঁহার সকল সেবাকার্য্যের মূলে থাকিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ই সফলতা দান করিয়াছে।

এইরূপে মহাত্মা মানবের পূজা করিয়াছেন। মানবের পূজা করিতে গিয়া তাঁহার জীবনে কত অপমান, কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। কতবার তাঁহাকে কারাগার বরণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার কারাজীবনের বর্ণনা করিতে বসিলে একখানা ইতিহাস হইয়া পড়ে। সে ইতিহাস প্রণয়নে আমার আজ মন নাই। আমার মন আজ অন্য এক ভাবে আপ্লুত। মানবপূজা, মানবপূজা, মানবপূজা! মানবের পূজা করিতে করিতে শেষে মানব নিজেই পূজা পাইতে থাকে! কি মোহন চিত্র! ঐ আমাদের মহাত্মা গান্ধী!

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরের ঊষা। নাগপুরের বক্ষের উপর আজিকার ঊষার পবিত্রোজ্জ্বলকিরণসম্পাত নাগপুর-নগর-বাসি-নরকুল-হৃদয়ের মোহান্ধকার চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারিবে কি? একমুহূর্ত্তের নরদেবদর্শনে, একদিন দুইদিন তিনদিনের নরদেবপূজায়, যদি মানুষের মোহান্ধকার অপসৃত হইত তবে পৃথিবী অনায়াসেই চিরস্বর্গে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু তা তো হয় না। অল্পে অল্পে জনে জনে সুদীর্ঘ কঠোর সাধনায় মানুষ দেবতা হয়। সমগ্র মানবত্বের দেবত্ব মোহময়ী কল্পনা মাত্র! সুবিশাল পৃথিবীর এতটুকু অংশও যদি স্বর্গ হইত! এক সময়ে না এই ভারতবর্ষই স্বর্গের সম্পর্কে আনন্দধাম ছিল!

ঐ যে নদীস্রোতের ন্যায় নরগণ চলিয়াছে। আজনি-জেল-রোডের উপর দিয়া আজ নরের স্রোত বহিতেছে। সেন্ট্রাল

ষ্টেশনের অনতিদূরে ঐ যে পত্রভূষিত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে ; পার্শ্বে তার ঐ যে কদলীবৃক্ষদ্বয় মাঙ্গল্য সূচনা করিতেছে।

ঐ আসিলেন মহাত্মা গান্ধী ! বন্দে মাতরম্। মহাত্মা গান্ধী কি জয় ! ঐ সুন্দরী যুবতী পুষ্পমাল্য হস্তে ! পূজার উপকরণ পুষ্পমাল্য মহাত্মার গ্রীবা স্কন্ধ বক্ষ আচ্ছাদন করিল।

মোটরকার দ্রুত চলিয়া গেল। নরগণ পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। ঐ যে কার থামিয়াছে। শীঘ্র চল, দেখিয়া লও। ডক্টার খারের বাড়ীর সম্মুখে কারের চারি পার্শ্বে আবার উচ্ছসিত জনতরঙ্গ। কুঙ্কুমাদি হস্তে ঐ যে বামাগণ আবার খারেগৃহ হইতে আসিল। মহাত্মার ললাটে বৃহৎ কুঙ্কুমবিন্দু শোভিত হইল। অদ্ভুত মানবপূজা ! বৃদ্ধ মহাত্মা মধুর স্মিতাস্তে ভক্তের মনে সন্তোষ দান করিলেন।

পটবর্দ্ধন-উচ্চ-বিদ্যালয়ের ক্রীড়াভূমি,—ধানতলির বৃহৎ ময়দান। বিস্তৃত বিতাননিম্নে মঞ্চোপরি কেদারায় সমাসীন মহাত্মা গান্ধী। লোক আর লোক, চতুর্দ্দিকে লোক। মহাসিন্ধুর উর্ম্মিমালা। উকিল, প্রফেসার, মাষ্টার, ব্যবসায়ী, ধের, মেথর, ভিক্ষুক—বিপুল নরসমবায়। অস্পৃশ্য-জাতির উন্নতি চাই, অর্থ চাই। দাতার দেশ ভারতবর্ষ। তাহাতে মহাত্মার আহ্বান। অর্থ সংগ্রীহিত হইল।

একপার্শ্বে ঐ যে হরিজন বসিয়াছে। সার্থক বণিক্, সার্থক তোমার অর্থ। আজিকার দিনে ঐ যে হরিজন সুভোজ্য সুপেয়ে পরিতৃপ্ত হইতেছে—ইহাতে তোমারও উন্নতি নিহিত।

মহাত্মা উঠিলেন। অন্যত্র যাইতে হইবে ; এবং অবশেষে অস্পৃশ্যদেরও আবাস পরিদর্শন করিতে হইবে। মঞ্চ হইতে মোটর কার

পর্য্যন্ত কতটুকুই বা দূরত্ব! কিন্তু এতটুকু পথও মহাত্মা আজ চলিতে পারেন না। শারীরিক অশক্তি নয়,—চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দোদ্বেলিত-নরোর্ম্মিসম্পাত! স্বেচ্ছাসেবকগণ পরস্পরধৃত-হস্তরচিত-বৃত্তদুর্গ মধ্যে মহাত্মাকে সংরক্ষিত করিয়া চলিতেছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণও পথ পায় না, সকলেই বুঝি পিষ্ট হয়! মহাপুরুষের দর্শনে স্পর্শনে পুণ্য—ইহা হিন্দুভারতের অস্থিমজ্জাগত সংস্কার। এ সংস্কার, এ মোহ আমাকেও পাইয়া বসিল। দর্শন তো হইয়াছে। এখন কিরূপে মহাত্মার দেহ স্পর্শ করিতে পারি? ঐ লোকসমুদ্রের মধ্যে আমিও যে মগ্ন, পিষ্ট। তা হই,—মহাত্মাকে স্পর্শ করিতে হইবে। মহাত্মার কারের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। এই তো মহাত্মা উঠিতেছেন। বাসনা পূর্ণ হইল। দেহ বুঝি স্পর্শ করিতে পারিলাম না! দেহাবরণ ঐ খদ্দরের চাদরই আমার পক্ষে পরম পবিত্র। ঐ স্পর্শই আমার জীবনের এক পুণ্য স্মৃতি।

আর এক সময়ের কথা মনে পড়ে। লবণ প্রস্তুত করিয়া উপদ্রব-বিহীন ভাবে আইন অমান্য করিবার কালে এবং এইরূপ আরও নানা ভাবে বৈধ সংগ্রামে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস সময়ে এই নাগপুরে লোকের মনে তখন কেমন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল! মহাত্মা তখন সশরীরে নাগপুরে আসিয়াছিলেন না,—অবশ্য এখানে তিনি আরও আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা এখন বলিতেছি না। সশরীরে তখন আসিয়াছিলেন না, সত্য। কিন্তু বলিতে গেলে, নাগপুরে তাঁহারই পূজার উৎসব চলিতেছিল। তাঁহার বাণী আর তাঁহার আদেশ নাগপুরের কাণে কাণে সর্ব্বক্ষণ ধ্বনি তুলিত। নাগপুরের রাস্তায়, নাগপুরের মাঠে,

নাগপুরের বাগানে শোভাযাত্রা আর সভা। আজিকার চেয়েও তখনকার উত্তেজনা যেন আরও প্রবল, জনসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ যেন আরও উদ্দাম! অতি প্রত্যূষে, দুপুরে, সন্ধ্যায় অগণিত নরের মিছিল; স্বতন্ত্রতাপ্রিয় অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সুন্দরীর মোহিনী শোভাযাত্রা! হস্তে ত্রিরঙের পতাকা। কণ্ঠে মাতৃবন্দনা আর মহাত্মা-পূজা-মন্ত্র! কয়েক মাসের মধ্যেই রাজপ্রতিনিধি উইলিংডনের শাসনে কেমন যেন এক যাদুমন্ত্রে সব ঘুমাইয়া পড়িল! অশ্বক্ষুরের ধ্বনিতে, অশ্বারোহী সিপাহীর জনতাভেদী প্রধাবনে লোকসাগর আশ্চর্যরূপে মন্থিত হইল, স্তব্ধ হইল।

আজ আবার সহসা মধ্যরাত্রির নিদ্রা হইতে জাগিয়া ঘুমের ঘোরে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পতাকা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঐ যে লোকেরা ছুটিয়াছে। সেই শাসন আজও রহিয়াছে; কিন্তু মহাত্মার পূজায় আজ নিষেধ নাই। ভারত সরকার আজ মানবপূজায় বাধা দিতেছে না কেন? কেন দিবে? মানবত্বকে সর্ব্বতোভাবে ক্ষুণ্ন কবিতে মানব পারে না তো! পুরুকে গৌরব দান করিয়া দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডারের গৌরব বাড়িয়াই গিয়াছে। যদি আলেক্জাণ্ডার বীরত্বের সম্মান না করিত তবে তাঁহারই আত্মার সঙ্কোচ হইত,—পুরুর দেহের যেরূপ গতিই হইক। এত বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বৃটিশ জাতির মধ্যে মানুষ নাই—ইহা হইতেই পারে না। মানুষ আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যের মোহে মানুষত্বার বিকাশ সকলের দ্বারা, বা সকল কালে, বা সকল ভাবে সম্ভব হয় না। তাই আজ শাসনের মধ্যেও সম্মান; কারার মধ্যেও পূজা। তাই আজ মহাত্মার মুক্তি। তাই আজ মহাত্মার পূজায় বাধার

প্রত্যাহার। তাই আজ অনেকদিন পরে আবার শুনিতেছি, সেই কালের সঙ্গীতধ্বনি যেন গগন ভেদিয়া উঠিতেছে :

বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গ পীয়ারা।
ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা॥

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
—	—	মুদ্রিত	মুদ্রিত
৭	৬	সুখবোধে	সুখবোধের
৮	৭	থাকে	থাকে
১৫	১৭	অবলম্ব	অবলম্বন
২৬	১৬	চূনী	চূর্ণী
৫৪	৯	জগজ্জনী	জগজ্জননী
৫৯	১৯	কাশ্যশেয়	কাশ্যপেয়
৬২	১৩	পুরুষ প্রধান	পুরুষ-প্রধান
৭১	১৬	ক্যালোপাস্	ক্যানোপাস্
৭২	১৯	ধাকে	থাকে
৭৫	১৭	ইহাকে	ইহাকে
৭৬	৩	অদ্ভুত	অদ্ভুত
৮০	১৫	শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীরামকৃষ্ণ
৮৮	২০	নরের	নারীর
৯৪	৩	চিন্তার	বিস্তার
১০৬	৩	বিষদৃশ	বিষদৃশ
১১৩	১৩	হাসভায়	মহাসভায়